পরিকল্পন ও পরিকল্পনা
Planning and Plan

৪

পরিকল্পন একক ঘটনা বিশিষ্ট কোনো বিষয় নয়। এর কোনো সুস্পষ্ট শুরু নেই এবং শেষও নেই। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটলে পরিকল্পনেও পরিবর্তন ঘটে। তাই ব্যবস্থাপকদের অন্যতম ‘প্ল্যানিং’ চ্যালেঞ্জ হলো নিজেদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং অন্যদের (বিশেষ করে, প্রতিযোগীদের) কর্মকাণ্ডের সাথে সংগতি রেখে নিজেদের পরিকল্পনার যথাযথ পরিবর্তন আনয়ন করা। অত্র ইউনিটে পরিকল্পন ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি তুলে ধরা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আলোচনা করার সময় ব্যবসায়িক জগতের বাস্তবতার ব্যাপারটি খেয়ালে রাখা হয়েছে। ফলে আপনি সহজেই আপনার অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জগতে কাজে লাগাতে পারবেন। পরিকল্পনার বিষয়টিই সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক, এতে তাত্ত্বিকতার বিশেষ স্থান নেই। তাই এখানে তত্ত্বের চেয়ে বাস্তবতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১: পরিকল্পন: কী ও কেন
পাঠ - ৪.২: পরিকল্পন প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ
পাঠ - ৪.৩: পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যকার সম্পর্ক
পাঠ - ৪.৪: পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ
পাঠ - ৪.৫: ব্যবস্থাপনার স্তরভিত্তিক পরিকল্পনা
পাঠ - ৪.৬: পরিকল্পন: কৌশল ও কৌশলিক পরিকল্পন
পাঠ - ৪.৭: লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

বি: দ্র: Planning শব্দের অর্থ ব্যাকরণগত কারণে ‘পরিকল্পন’ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যদিও অনেকে Planning-এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘পরিকল্পনা’ লিখে থাকেন। এ শব্দটি একটি gerund; সেহেতু এর অর্থ পরিকল্পন হওয়া উচিত। তাছাড়া প্রত্যয়ের দিক থেকে চিন্তা করলেও Planning-এর বাংলা ‘পরিকল্পন’ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। প্ল্যান (Plan)-এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘পরিকল্পনা’ হতে পারে।

পাঠ ৪.১ পরিকল্পনঃ কী ও কেন
Planning: What and Why

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিকল্পন এর অর্থ কী বলতে পারবেন।
- পরিকল্পনের প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রকৃতপক্ষে, পরিকল্পন একটি বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের এ 'ভবিষ্যৎ' নিয়েই মাথা ঘামাতে হয় অহরহ। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার চারটি মৌলিক কাজের প্রথমটিই হলো পরিকল্পন। আপনি পরিকল্পনকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করতে পারেন, যা সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণের 'গাড়িকে' সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, অথবা আপনি পরিকল্পনকে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন, যার কাণ্ড থেকে সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণের শাখাগুলো গজিয়ে ওঠে পল্লবিত হয়। পরিকল্পন তাই ব্যবস্থাপকদের জন্য খুবই গুরুত্ববহ এবং একই সাথে জটিল ও চ্যালেঞ্জিং।

পরিকল্পন এর অর্থ
Meaning of planning

কোনো প্রতিষ্ঠান আপনা আপনি গড়ে ওঠে না। এর পেছনে থাকে কতিপয় ব্যক্তির সমবেত প্রচেষ্টা। ব্যক্তিবর্গ একটি সাধারণ লক্ষ্য (common objectives) অর্জনের জন্য সমবেত হয়। একটি প্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো ব্যক্তির সমাহার। এসব ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে একসাথে কাজ করে। তাদের এ টিমওয়ার্কের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জন করা। এ লক্ষ্য কোনো পণ্য উৎপাদন হতে পারে কিংবা কোনো সেবা প্রদানও হতে পারে। লক্ষ্য যাই হোক না কেন, তা অর্জনের জন্য সুন্দর, সুশৃঙ্খল পরিবেশ প্রয়োজন। উত্তম পরিবেশ এমনিতে সৃষ্টি হয় না। এর জন্য দরকার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং তা অর্জনের জন্য ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবহিতি। যারা একযোগে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করেন তাদের ফলপ্রসূ কর্মসম্পাদন সুনিশ্চিত করার জন্যই এমন পরিবেশ তৈরি করা বাঞ্ছনীয়, যেখানে সবাই বোঝতে পারবেন 'তারা কী করবেন এবং তাদের নিকট থেকে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে।' এটাই পরিকল্পনের কাজ। যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনই হলো সবকিছুর মূলে। সারা বিশ্বে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। ক্রমপরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পরিবর্তন এবং প্রবৃদ্ধি অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে বটে কিন্তু ঝুঁকিও বাড়ায়। বিশ্বব্যাপী বাজার, সম্পদ ও প্রভাব সৃষ্টির প্রতিযোগিতার কারণে ঝুঁকির দিগন্ত দিনকে দিন প্রসারিত হচ্ছে। একমাত্র সুষ্ঠু পরিকল্পনের মাধ্যমে একদিকে যেমন ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস করা যায়, তেমনি একই সাথে সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন ওঠতে পারে, পরিকল্পন কী? যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিকল্পন বলতে সত্যিকার অর্থে কী বোঝায়? একটি প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে গৃহীতব্য বিভিন্ন প্রকার বিকল্প কর্মপন্থা থেকে উপযুক্ত কর্মপন্থা বাছাই করার প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে পরিকল্পন বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের বিভিন্ন বিভাগের অভিলক্ষ্য (goal) নির্ধারণ এবং সেগুলো অর্জনের পন্থা নিরূপণের সাথে পরিকল্পন জড়িত। আসলে, পরিকল্পন মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কিসের সিদ্ধান্ত? প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রত্যেকটি বিভাগ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করবে

তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত। কী করা হবে, কীভাবে করা হবে, কখন করা হবে এবং কে করবে ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পন। কোথায় আমাদের অবস্থান আর কোথায় আমরা যেতে চাই- এ দুয়ের মধ্যকার বিরাজমান ফারাকের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে পরিকল্পন। Koontz এবং তাঁর সহকর্মীরা পরিকল্পনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: "Planning is essentially deciding what objectives we want to accomplish, what actions should be taken to achieve them, what organizational position is assigned to do them, and who would be responsible for the actions needed "।[১] তাঁরা মনে করেন, "ব্রত ও লক্ষ্য নির্বাচন এবং এগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের সাথে পরিকল্পনা জড়িত; এর জন্য প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থাৎ বিকল্প কর্মপন্থা হতে উত্তম কর্মপন্থা নির্বাচন" [Planning involves selecting mission and objectives and the action to achieve them; it requires decision making, that is, choosing future course of action among alternatives.]

কুঞ্জের এ প্রশংসিত সংজ্ঞা থেকে আমরা বলতে পারি যে, পরিকল্পন মানেই হলো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমালা অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলির জন্য কারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, সে সম্পর্কে আগেভাগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কী লক্ষ্যমালা (objectives) হাসিল করা হবে, এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত, কখন ও কীভাবে কর্মপন্থাসমূহ অবলম্বন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা কোন কোন ব্যক্তি গ্রহণ করবে এসব বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই পরিকল্পন বলে।

পরিকল্পন এর প্রকৃতি

Nature of planning

পরিকল্পন-এর প্রকৃতিকে চারটি উল্লেখযোগ্য নীতিমালার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়:

(১) প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমালা অর্জনে অবদানের নীতি;
(২) পরিকল্পনের প্রাধান্য নীতি;
(৩) পরিকল্পনের ব্যাপকতার নীতি;
(৪) পরিকল্পনের নৈপুণ্য নীতি।

১. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমালা অর্জনে অবদান: পরিকল্পন সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। আমরা জানি, যে কোনো প্রতিষ্ঠানই সংগঠিত। আর সংগঠিত প্রতিষ্ঠান বিশেষ লক্ষ্য হাসিলের জন্য কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তির সমন্বিত সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রতিষ্ঠানের এরূপ প্রকৃতির কারণেই প্রত্যেকটি মুখ্য ও গৌণ পরিকল্পনার একটিই উদ্দেশ্য থাকে তা হলো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি করা।

২. পরিকল্পনের প্রাধান্য: ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির মধ্যে পরিকল্পনের অগ্রগণ্যতা সহজেই অনুমেয়। পরিকল্পনকালে যেসব বিষয় স্থির করা হয় তার ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপকীয় অন্যান্য কার্যাবলির (সংগঠন, কর্মীসংগ্রহ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়। সব কাজের মধ্যে পরিকল্পন প্রাধান্য পায় এ কারণে যে, পরিকল্পনা তৈরির সময় প্রতিষ্ঠানের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, সে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কার্যাবলি আবর্তিত হয়। ব্যবস্থাপকের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য এ কাজগুলোর জন্যও আলাদা পরিকল্পনা তৈরি আবশ্যক। পরিকল্পন এবং নিয়ন্ত্রণ যমজ ভাই-এর মতো। একটিকে অবহেলা করা হলে আরেকটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। অপরিকল্পিত কাজকে কখনো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কারণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যই হলো পরিকল্পনা অনুসারে কাজকর্ম ঠিকমত চলছে কি না তা দেখা। পরিকল্পনা ব্যতীত নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা অর্থহীন। পরিকল্পনা না থাকলে একজন কর্মী বোঝতেই পারবে না সে কোথায় যাচ্ছে কিংবা কোথায় গিয়ে তাকে শেষ করতে হবে। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের এরূপ পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য এদেরকে কোনো কোনো গ্রন্থকার "Siamese Twins of Management" নামে অভিহিত করেছেন।

৩. পরিকল্পনের ব্যাপকতা: প্রতিষ্ঠানে যত ব্যবস্থাপক থাকেন, সবাই কোনো না কোনোভাবে পরিকল্পনের সাথে জড়িত। কেউ হয়তো অন্যের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করে থাকেন কিংবা তাকে অধিক সংখ্যায় পরিকল্পনা

[১] Koontz, H., Weihrich, H. and Cannice, M.V. (2020). Essentials of management: An international, innovation and leadership perspective. McGraw-Hill Education.

তৈরি করতে হয়। একজনের তৈরি পরিকল্পনা হয়তো প্রতিষ্ঠানের ওপর সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আবার হয়তো আরেক জনের তৈরি পরিকল্পনা শুধু একটি ক্ষুদ্র বিভাগের ক্ষুদ্র গণ্ডির ওপর ব্যতীত অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার যে, সব ব্যবস্থাপকই কোনো না কোনো পর্যায়ে অহরহ পরিকল্পনা তৈরি করে থাকেন। তাই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনের ব্যাপকতা সর্বজন স্বীকৃত।

৪. পরিকল্পনার নৈপুণ্য: একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে খরচ পড়ে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কতটুকু পরিমাণে লক্ষ্য হাসিলে অবদান রাখতে পারে তা দিয়ে পরিকল্পনার নৈপুণ্য পরিমাপ করা যায়। লক্ষ্য অর্জনে যদি অত্যধিক খরচের প্রয়োজন হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাকে নিপুণ বলা যাবে না।

পরিকল্পন সম্পর্কে আমরা সার্বিক একটি ধারণা পেলাম। মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, পরিকল্পনা প্রণয়ন কীভাবে করব? কিছু পদক্ষেপ যদি আমরা সঠিকভাবে নিতে পারি তাহলে ফলপ্রসূ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা তেমন কোনো জটিল কাজ নয়। পরবর্তী পাঠে আমরা পরিকল্পনে জড়িত পদক্ষেপুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

একটি প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে গৃহীতব্য বিভিন্ন প্রকার বিকল্প কর্মপন্থা থেকে উপযুক্ত কর্মপন্থা বাছাই করার প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে পরিকল্পন বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের বিভিন্ন বিভাগের অভিলক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেগুলো অর্জনের পন্থা নিরূপণের সাথে পরিকল্পন জড়িত। পরিকল্পন মানেই হলো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমালা অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলির জন্য কারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, সে সম্পর্কে আগেভাগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরিকল্পন-এর প্রকৃতিকে চারটি উল্লেখযোগ্য নীতিমালার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়: প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমালা অর্জনে অবদানের নীতি, পরিকল্পনের প্রাধান্য নীতি, পরিকল্পনের ব্যাপকতার নীতি এবং পরিকল্পনের নৈপুণ্য নীতি।

পাঠ ৪.২ পরিকল্পন প্রণয়নের পদক্ষেপসমূহ
Steps in Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিকল্পন প্রণয়নের পদক্ষেপগুলো বলতে পারবেন।

ধনদৌলত ও খ্যাতি অর্জনের স্বপ্ন আমাদের সবারই থাকে। পাশাপাশি অন্যদের কাছ থেকে প্রশংসা ও সম্মান পাওয়ার ইচ্ছাও লুকায়িত থাকে। এ স্বপ্ন এবং ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের প্রয়োজন নির্দিষ্ট ও পরিমেয় লক্ষ্য[2] নির্ধারণ করা যা বাস্তবসম্মত এবং নির্দিষ্ট সময়ে অর্জনযোগ্য। সংগঠনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পরিকল্পনা ছাড়া ব্যবস্থাপকের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং কর্মীদের সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করা সম্ভব নয়। এমনকি "কী" সংগঠিত করতে হবে তাও তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না। তেমনি পরিকল্পনা ছাড়া প্রত্যয়ের সাথে অন্যদের নেতৃত্ব দেওয়াও সম্ভব হবে না। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া তখন নিষ্ফল হয়ে যায়। এখান থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, পরিকল্পনার সাথে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং সঠিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পন তৈরির জন্য ধাপে ধাপে এগুতে হয়। এ ধাপগুলো পরিকল্পন প্রণয়নের পদক্ষেপ। তাহলে আসুন পরিকল্পন প্রণয়নের পদক্ষেপগুলো কী তা জেনে নেই।

পরিকল্পন-এর পদক্ষেপসমূহ
Steps in planning

পরিকল্পন হলো ভবিষ্যতমুখী। অতীতের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের করণীয় নির্ধারণ করা হয় পরিকল্পন প্রক্রিয়ায়। প্রক্রিয়া হিসেবে পরিকল্পন-এ অনেকগুলো স্তর বা ধাপ আছে। এগুলোকে পদক্ষেপও বলা যায়। পরিকল্পন প্রণয়ন করার সময় পদক্ষেপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়।

১. সুযোগ বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত (Awareness of opportunities/problems)
২. প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ (Collection of relevant information)
৩. তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of information)
৪. লক্ষ্য নির্ধারণ (Setting objectives)
৫. পরিকল্পনার অঙ্গন বা পটভূমি প্রতিষ্ঠা (Establishing planning premises)
৬. বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ (Determining alternative courses of action)
৭. বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ পর্যালোচনা (Analysis of alternative courses of action)
৮. উপযুক্ত কর্মপন্থা বাছাইকরণ (Selection of proper course of action)
৯. গৌণ পরিকল্পনা প্রণয়ন (Preparing derivative plans)
১০. পরিকল্পনাকে বাজেটে রূপান্তর (Budgeting)
১১. অনুবর্তন (Follow up)

আসুন এ পদক্ষেপগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

(১) সুযোগ বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া: হ্যারল্ড কুঞ্জ প্রমুখের মতে, মুখ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হলো কোনো সুযোগ (opportunity) বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যে সমস্যা বা বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা হবে,

[2] যদিও অনেকেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আলাদা করে থাকেন, এখানে আমরা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি।

সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি করার পর তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা দরকার। এ পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুযোগসমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করেন, নিজের প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও সীমাবদ্ধতার আলোকে নিজের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞানাহরণের প্রচেষ্টা চালান এবং সম্ভাব্য সুযোগসমূহ থেকে কী ফল প্রত্যাশা করেন তা অনুধাবন করার প্রয়াস পান। এসব বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ওপর বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ নির্ভরশীল। পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে সুযোগ ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান তার সার্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

(২) প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ: পরিকল্পনার সাথে জড়িত কার্যাবলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্যের প্রধান উৎসগুলো হলো অভিজ্ঞতা, অতীতে সমাধানকৃত সমস্যাসমূহ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি, পর্যবেক্ষণ, রেকর্ডপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি।

(৩)তথ্য বিশ্লেষণ: সংগৃহীত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, কোন কোন তথ্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং কোনগুলো পরিকল্পনার সাথে জড়িত। বিশ্লেষণের জন্য তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস এবং সারণিকরণ প্রয়োজন।

(৪) প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ: প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই একটি মূল লক্ষ্য থাকে। সে লক্ষ্য কী হবে তা নির্ধারণ করা ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এ কারণে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার। তাই প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। প্রথমত, সমগ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্য নিরূপণ করা হয় এবং এরপর প্রতিটি বিভাগ বা সেকশনের লক্ষ্য স্থির করা হয়। লক্ষ্যসমূহ কতিপয় বিষয় নির্দেশ করে-(ক) ভবিষ্যতে কী কী কাজ করা হবে তার স্বরূপ, (খ) কোথায় কোথায় প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, এবং (গ) পলিসি, কৌশল, নিয়মাবলি, বাজেট, কর্মসূচি ইত্যাদির সমাহারে কী কী সম্পাদন করা হবে।

উল্লেখ্য যে, চলমান প্রতিষ্ঠানে আগে থেকেই মূল লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে। তাই এরূপ প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনের সময় সমস্যাভিত্তিক বা ইস্যুভিত্তিক লক্ষ্যমালা স্থির করা হয়।

(৫) পরিকল্পন-এর অঙ্গন বা পটভূমি প্রতিষ্ঠা: পরিকল্পনের তৃতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার অঙ্গন (premises) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পন সম্পর্কিত অনুমিতিকে পরিকল্পনাঙ্গন বলে। অন্য কথায় বলা যায়, পরিকল্পনা চালু থাকা অবস্থায় পরিকল্পন-এর প্রত্যাশিত পরিবেশই হলো পরিকল্পনাঙ্গন। অঙ্গন প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অঙ্গনায়নে (premising) পূর্বানুমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পণ্যের বাজার, বিক্রয়ের পরিমাণ, পণ্যের মূল্য, পণ্যের প্রকারভেদ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, খরচের পরিমাণ, মজুরির হার, করের হার, কর-পলিসি, লভ্যাংশ বিতরণ সম্পর্কিত নীতিমালা কারখানার সম্প্রসারণ, অর্থায়ন, রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশের স্বরূপ ইত্যাদি পূর্বানুমান করা পরিকল্পনার ফলপ্রসূতার জন্য খুবই জরুরি। পূর্বানুমানকৃত তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্গনায়ন করা হয় এবং প্রতিষ্ঠিত অঙ্গনকে প্রেক্ষাপটে রেখে প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়।

পরিকল্পন-এর অঙ্গনকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

পরিকল্পনাঙ্গন

- নিয়ন্ত্রণযোগ্য অঙ্গন (Controllable premises)
- নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য অঙ্গন (Non-controllable premises)
- আর্ধ নিয়ন্ত্রণযোগ্য অঙ্গন (Semi-controllable premises)

কতিপয় পরিকল্পনাঙ্গন রয়েছে যেগুলো ব্যবস্থাপকদেও পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এরূপ নিয়ন্ত্রণযোগ্য অঙ্গনগুলো হলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার আর্থিক, প্রশাসনিক বা অন্যান্য পলিসিসমূহ, গবেষণা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচিসমূহ ইত্যাদি। অপরপক্ষে এমন কিছু অঙ্গন রয়েছে যেগুলো ব্যবস্থাপকদেও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বাইরে। যেমন, দেশের জনসংখ্যা

হ্রাস বা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সরকারের আমদানি-রপ্তানি নীতি, আর্থিক নীতি (fiscal policy), চোরাকারবারের ফলে পণ্যের মূল্যে অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি। এগুলো হলো অনিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিকল্পনাঙ্গন। আর, যেসব বিষয়গুলো ব্যবস্থাপকেরা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সেগুলো আধা-নিয়ন্ত্রণযোগ্য অঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, শ্রমিক-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা, বাজার বিভাজনের মাধ্যমে বাজারের অংশ নিজ প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনয়ন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি।

(৬) বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ: একটি পরিকল্পনাকে সার্থকতার আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এমন একটি পরিকল্পনা বা প্ল্যান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে যার সফল বাস্তবায়নের জন্য বেশ কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত বিকল্প কর্মপন্থা নেই। অনেক সময় দেখা যায়, যে বিকল্পটির ওপর কেউ তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়নি সেটিই শেষ পর্যন্ত শ্রেয় প্রমাণিত হয়েছে। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর অন্যতম দায়িত্ব হলো পরিকল্পন-এর অঙ্গন প্রতিষ্ঠার পর পরই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সম্ভাব্য বিকল্প কর্মপন্থা নিরূপণ করে সেগুলোর বাস্তবায়নযোগ্যতা পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা।

(৭) বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ পর্যালোচনা: বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ নির্ধারণ করে এগুলোর ভালো ও মন্দ দিকগুলো পরীক্ষানিরীক্ষার পর প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যের আলোকে কর্মপন্থাসমূহকে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। প্রশ্ন ওঠতে পারে- কী পর্যালোচনা করে দেখা হয়? বিকল্পগুলোর প্রয়োগযোগ্যতা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়। অর্থাৎ একটি বিকল্প আরেকটির তুলনায় শ্রেয়, না কি নিকৃষ্ট এবং কেন শ্রেয় বা নিকৃষ্ট তা বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। যেমন, একটি কর্মপন্থা খুবই লাভজনক প্রতীয়মান হতে পারে কিন্তু এর জন্য আবার প্রয়োজন প্রচুর পুঁজির, অথচ মুনাফা পেতে সময় লাগবে অনেক বেশি। অনুরূপভাবে, আরেকটি কর্মপন্থা কম লাভজনক কিন্তু এতে ঝুঁকিও কম। আবার তৃতীয় কর্মপন্থাটি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ বিধায় এটি এ কারণে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে। বিভিন্ন কর্মপন্থার ভালো দিকও যেমন আছে, তেমনি মন্দ দিকও আছে। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর দায়িত্ব হলো, এগুলোর বিভিন্ন দিকের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা। আজকের যুগে উন্নত বিশ্বে কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন গাণিতিক মডেলের সাহায্য বিকল্পের সংখ্যা কমানোর প্রয়াস নেওয়া হয়।

(৮) উপযুক্ত কর্মপন্থা বাছাইকরণ: বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা পর্যালোচনার পর কোনটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তা নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থাপক এ পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয় এবং বৈজ্ঞানিক কৌশলাদিও প্রয়োগ ছাড়াও নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করতে হয়। কারণ সত্যিকার অর্থে এ পর্যায়েই চূড়ান্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সঠিক কর্মপন্থা নির্বাচনে ভুল হলে পরবর্তীকালে সে ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানে লাল বাতি জ্বলার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হলে ব্যবস্থাপক একাধিক কর্মপন্থাও একই সাথে গ্রহণ করতে পারেন। একই সাথে একাধিক কর্মপন্থা অনুসরণ করার নজীর অনেক রয়েছে বলে গবেষকদের গবেষণা থেকে জানা যায়।

(৯) গৌণ পরিকল্পনা প্রণয়ন: এক বা একাধিক উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হলে 'মূল পরিকল্পনা' সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বটে, কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়নের সব কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় না। এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপককে মূল লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে মূল পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে কতিপয় গৌণ বা সহকারী পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। মূল পরিকল্পনাকে সার্পোট করার জন্য গৌণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পাটের কল স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোক্তাকে আরও কয়েকটি সহায়ক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে- যেমন, কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা, যন্ত্রপাতি কেনার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

(১০) পরিকল্পনাকে বাজেটে রূপান্তর: কোনো কোনো গ্রন্থকারের মতে, গৌণ পরিকল্পনা তৈরির সাথে সাথেই পরিকল্পনার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। তাদের মতে, গৌণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে অষ্টম ধাপে এসে গৃহীত পরিকল্পনগুলোকে সংখ্যাত্মকরূপে বাজেটে পরিণত করা প্রয়োজন; তাহলেই পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। পরিকল্পনাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হলে তাকে বাজেট বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের বাজেটে মোট আয় ও ব্যয়, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রত্যেক বিভাগের আলাদা বাজেট থাকতে পারে, যা সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক বাজেটের সাথে সম্পর্কিত।

(১১) অনুবর্তন: পরিকল্পন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পদক্ষেপ হলো অনুবর্তন (follow up)। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ইতোপূর্বে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, শেষ পর্যায়ে এ বিষয়টি দেখা হয়। অনুবর্তনকালে কোনো প্রকার সমস্যা দেখা দিলে পরিকল্পনা প্রণেতারা তা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেন।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার গৃহীত প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন প্রকার তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বানুমান করেন এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য সম্ভাব্য ঘটনাবলি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেন। এ কারণে আহরিত তথ্যের গুণমানের ওপর পরিকল্পনার গুণমান বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে হাত দেওয়ার পূর্বেই সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলি সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থাপকের সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সারসংক্ষেপ

পরিকল্পন হলো ভবিষ্যতমুখী। পরিকল্পন প্রক্রিয়ায় অতীতের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের করণীয় নির্ধারণ করা হয়। প্রক্রিয়া হিসেবে পরিকল্পন-এ অনেকগুলো স্তর বা ধাপ আছে। এগুলোকে পদক্ষেপও বলা যায়। পরিকল্পন প্রণয়ন করার সময় পদক্ষেপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়। মুখ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হলো কোনো সুযোগ বা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এর পরই পরিকল্পনার সাথে জড়িত কার্যাবলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, কোন কোন তথ্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং কোনগুলো পরিকল্পনার সাথে জড়িত। প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। প্রথমত, সমগ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্য নিরূপণ করা হয় এবং এরপর প্রতিটি বিভাগ বা সেকশনের লক্ষ্য স্থির করা হয়। পরিকল্পনের তৃতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার অঙ্গন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পন সম্পর্কিত অনুমিতিকে পরিকল্পনাঙ্গন বলে। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর অন্যতম দায়িত্ব হলো পরিকল্পন-এর অঙ্গন প্রতিষ্ঠার পর পরই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সম্ভাব্য বিকল্প কর্মপন্থা নিরূপণ করে সেগুলোর বাস্তবায়নযোগ্যতা পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা। বিকল্প কর্মপন্থাসমূহ নির্ধারণ করে এগুলোর ভালো ও মন্দ দিকগুলো পরীক্ষানিরীক্ষার পর প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যের আলোকে কর্মপন্থাসমূহকে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা পর্যালোচনার পর কোনটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তা নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থাপক এ পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্যবস্থাপককে মূল লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে মূল পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে কতিপয় গৌণ বা সহকারী পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। গৌণ পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে অষ্টম ধাপে এসে গৃহীত পরিকল্পনগুলোকে সংখ্যাত্মকরূপে বাজেটে পরিণত করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ইতোপূর্বে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, শেষ পর্যায়ে এ বিষয়টি দেখা হয়।

পাঠ ৪.৩ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যকার সম্পর্ক
Relationship between Plan and Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- পরিকল্পনা কী তা বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির সাথে পরিকল্পন-এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

যদিও ব্যবস্থাপনার চারটি কার্যাবলি বহুল প্রচলিত তথাপি ব্যবস্থাপনাকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয়: পরিকল্পন, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, যোগাযোগ, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ। 'পরিকল্পন' কার্য দিয়ে ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সমাপ্তি ঘটে 'নিয়ন্ত্রণ'-এর মধ্য দিয়ে। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে যদি আমরা একটি সড়কের সাথে তুলনা করি, তাহলে পরিকল্পনা হলো সড়কের একপ্রান্ত (মনে করি, যাত্রা শুরুর স্থান) এবং নিয়ন্ত্রণ হলো শেষ প্রান্ত (গন্তব্যস্থল)। এ দুয়ের মাঝখানে অবস্থান অন্যান্য কার্যাবলির। প্রশ্নাতীতভাবে ব্যবস্থাপকদের সর্বক্ষেত্রে পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করতে হয়। পরিকল্পনার সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক থাকে। কী সেই সম্পর্ক? তা জানার আগে আসুন সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেই পরিকল্পনা কাকে বলে, এরপরই আমরা ব্যবস্থাপনার সাথে পরিকল্পনার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
What is Plan

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, পরিকল্পন বা প্ল্যানিং হলো একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সম্পন্ন করা হবে এমন একটি কার্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। ভবিষ্যতে যে কাজটি করা হবে বা যা অর্জন করার জন্য চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, তা যেন সুষ্ঠুভাবে ও যৌক্তিক উপায়ে করা যায় সেজন্য পরিকল্পন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। পরিকল্পন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার পর যে দলিল তৈরি করা হয়, সেটিই হলো পরিকল্পনা বা প্ল্যান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনা (প্ল্যান) হলো পরিকল্পনের বাস্তব ফসল। পরিকল্পন প্রক্রিয়ার সৃষ্ট চিন্তাভাবনাকে সংখ্যাত্মক বা গুণাত্মক উপায়ে প্রকাশ করা হলে তা পরিকল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত হয়। পরিকল্পন থেকে পরিকল্পনার উদ্ভব।

ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলির সাথে পরিকল্পন-এর সম্পর্ক
Relationship between planning and other functions of management

পরিকল্পন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে; আর নিয়ন্ত্রণ রাখে অতীতের প্রতি। পরিকল্পনা যা করার জন্য প্রস্তাব করে, বাস্তবায়ন শেষে নিয়ন্ত্রণ তা মূল্যায়ন করে। মাঝখানের কাজগুলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। অথবা বলা যায়, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে লক্ষ্য হাসিলের জন্য অন্যান্য কাজগুলো পরিচালিত করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনের সাথে অন্যান্য ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক; সবগুলো কাজই পরিকল্পনের ওপর নির্ভরশীল। চিত্র ৪.১- এ পরিকল্পনের সাথে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

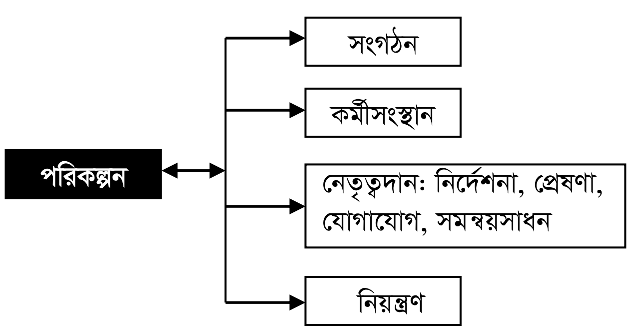

চিত্র ৪.১: ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলির সাথে পরিকল্পন-এর সম্পৃক্ততা

১ **পরিকল্পনের সাথে সংগঠনের সম্পর্ক:** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় কার্যাবলি সনাক্ত করে সেগুলো শ্রেণিবদ্ধ করা, কাকে কীরূপ ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং তার দায়িত্বের স্বরূপ কী তা বিনির্ধারণ করা, দরকারি উপকরণ সংগ্রহ করে এগুলো ব্যবহারের উপযোগী করে রাখা, ব্যবস্থাপকদের তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ করা, কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সংগঠন-কার্যের আওতাভুক্ত। এসব কাজ কীভাবে সম্পাদন করা হবে এবং কে করবে তা পরিকল্পনায় বলে দেওয়া থাকে। পরিকল্পনার প্রদত্ত মান অনুযায়ী সংগঠনকে কার্য সম্পাদন করতে হয়। সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, পরিকল্পন ব্যতীত 'সংগঠন' অস্তিত্বহীন।

২ **পরিকল্পনের সাথে কর্মীসংস্থানের সম্পর্ক:** বস্তুতপক্ষে কর্মীসংস্থান সংগঠনের একটি দিক। কর্মীসংস্থান কার্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সংগঠন-কাঠামো অনুসারে কর্মীর ব্যবস্থা করা। এর জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মকর্তা-কর্মচারী লাগবে তা নির্ধারণ, চালু প্রতিষ্ঠান হলে এ মধ্যে কতজন কর্মরত রয়েছে তার সংখ্যা নিরূপণ, নতুন কর্মী নিয়োগদান এবং রীতি অনুসারে সর্ব প্রকার কর্মীর পদোন্নতির ব্যবস্থাকরণ, তাদের কার্য মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণদান ইত্যাদি। কর্মীসংস্থান সম্পর্কিত এসব কাজ কখনো বিনা পরিকল্পনায় করা যায় না। পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে কর্মীসংস্থান কার্য সম্পন্ন করতে হয়। এ থেকেই পরিকল্পনার সাথে কর্মীসংস্থানের সম্পর্ক সহজেই প্রণিধানযোগ্য।

৩ **পরিকল্পনের সাথে নির্দেশনার সম্পর্ক:** অধস্তন কর্মীরা কী কাজ কীভাবে করবে তৎসম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিদেরকে অহরহ নির্দেশ প্রদান করতে হয়। তারা যে নির্দেশ দেন তা পরিকল্পনামাফিক না হলে প্রতিষ্ঠানে বিশৃংখলা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং পরিণামে লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হয়। আসলে, বাস্তবে পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্যই ব্যবস্থাপকেরা কর্মীদেরকে নির্দেশ দান করেন, যাতে কর্মীরা সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে দক্ষতার সাথে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

৪ **পরিকল্পনের সাথে প্রেষণার সম্পর্ক:** ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা বলতে ব্যবস্থাপক ও কর্মীদেরকে তাদের নিজ নিজ দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্ররোচিত করাকে বোঝায়। প্রেষণার মাধ্যমে কর্মরত ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্যার্জনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রেষণাদান যাতে সঠিকভাবে এবং কার্যকর উপায়ে সম্পাদন করা যায় সেজন্য যথাযথ পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য। কোন ধরনের কর্মীকে কী ধরনের প্রেষণা কী পদ্ধতিতে দেওয়া যথোপযুক্ত হবে, সে সম্পর্কে পরিকল্পনা না থাকলে প্রেষণাদানের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। পরিকল্পিত প্রেষণা পরিকল্পিত সংগঠনের পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের বিশেষ সহায়ক।

৫ **পরিকল্পনের সাথে যোগাযোগের সম্পর্ক:** বর্তমান যুগে 'যোগাযোগ'কে (communication) ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কার্য হিসেবে মনে করা হয়। আসলে যোগাযোগ কার্য অন্যান্য কার্যের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। কারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন থেথে শুরু করে নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপক এবং কর্মীদেরকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। যোগাযোগের এরূপ গুরুত্বের জন্যই এটি পরিকল্পিত হওয়া আবশ্যক। পরিকল্পনাহীন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারে, কাজের সাবলীল গতিপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনে গুরুতর বিঘ্নের জন্ম দিতে পারে।

৬ **পরিকল্পনের সাথে সমন্বয়সাধনের সম্পর্ক:** ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম কাজ হলো কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধন। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কর্মরত ব্যক্তিদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সুসংবদ্ধ করার প্রক্রিয়াই হলো সমন্বয়সাধন। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বয়সাধন খুবই জরুরি। আর এ সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া পরিকল্পনা মোতাবেকই পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির কোন কাজকে কিংবা কোন বিভাগের কোন কাজকে অন্য বিভাগের কোন কাজের সাথে সমন্বিত করতে হবে, তা পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে।

৭ **পরিকল্পনের সাথে নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক:** নিয়ন্ত্রণ মানে হলো পূর্ব-নির্ধারিত মান অনুসারে প্রত্যেক কর্মী কাজ করছে কি না কিংবা লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা যা করার দরকার তা পরিকল্পনা মোতাবেক করা হচ্ছে কি না, তা পরিমাপ করা। পরিকল্পনার সাথে নিয়ন্ত্রণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিকল্পনায় যে মান নির্ধারিত করে দেওয়া থাকে, সে মান অর্জিত হলো কি না তা মূল্যায়ন করে 'নিয়ন্ত্রণ' প্রতিষ্ঠানকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। 'পরিকল্পনা

কার্যধারা নিরূপণ করে এবং নিয়ন্ত্রণ সেই ধারা হতে বিচ্যুতির কার্যকারণ নিরূপণ করে তাকে সঠিক ধারায় আনয়ন করে।' সমগ্র এ আলোচনাটিকে আমরা নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখাতে পারি।

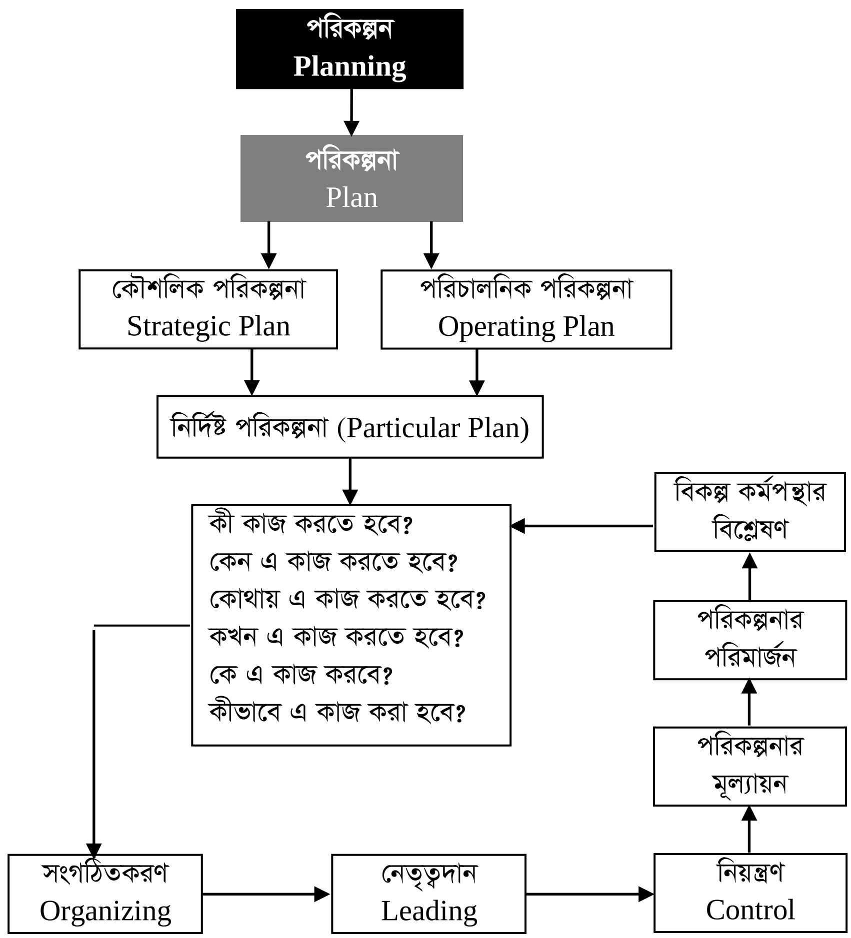

চিত্র ৪.২: সামগ্রিকভাবে পরিকল্পন ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্ক

সারসংক্ষেপ

ভবিষ্যতে যে কাজটি করা হবে বা যা অর্জন করার জন্য চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, তা যেন সুষ্ঠুভাবে ও যৌক্তিক উপায়ে করা যায় সেজন্য পরিকল্পন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। পরিকল্পন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার পর যে দলিল তৈরি করা হয়, সেটিই হলো পরিকল্পনা বা প্ল্যান। পরিকল্পন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে; আর নিয়ন্ত্রণ রাখে অতীতের প্রতি। পরিকল্পনা যা করার জন্য প্রস্তাব করে, বাস্তবায়ন শেষে নিয়ন্ত্রণ তা মূল্যায়ন করে। মাঝখানের কাজগুলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পরিকল্পনের সাথে অন্যান্য ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক; সবগুলো কাজই পরিকল্পনের ওপর নির্ভরশীল।

পাঠ ৪.৪ পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ
Classification of Plans

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- পরিকল্পনার স্তরগুলো বলতে পারবেন।
- পরিকল্পনার শ্রেণিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- লক্ষ্য ও অভিলক্ষ্য কী বলতে পারবেন।

পরিকল্পনা হলো লক্ষ্যমালা ও কর্মবিবরণীর (objectives and action statements) সমন্বয়ের প্রণীত সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা। পরিকল্পনায় লক্ষ্যমালা হলো গন্তব্যস্থল, আর কর্মবিবরণী হলো গন্তব্যস্থলে পৌঁছার উপায়। অন্যভাবে বলা যায়, লক্ষ্য হলো ব্যবস্থাপনার জন্য তীর মারার টার্গেট; কর্মবিবরণী হলো সেই টার্গেটে আঘাত করার জন্য প্রয়োজনীয় তীর। সঠিকভাবে চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে যথাসময়ে যথাযথ সম্পদ বিনিয়োগ করে ঈপ্সিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাধারণত দুপ্রকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়: (১) কৌশলিক পরিকল্পনা (strategic Plans) ও (২) পরিচালনিক পরিকল্পনা (operational plans)। কৌশলিক এবং পরিচালনিক পরিকল্পনাগুলোকে স্তরের (hierarchy) মাধ্যমে বিন্যাস করে সাজানো হয় (চিত্র ৪.৩ দেখুন)। চিত্রে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে 'ব্রত বিবরণী' (mission statement) যা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বোঝানো হয়। পরিকল্পনার অঙ্গনের (premises) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্যকে এ বিবরণীর মাধমে তুলে ধরা হয়। এর ওপর ভিত্তি করে কৌশলিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। আর কৌশলিক পরিকল্পনাকে বিবেচনায় রেখে পরিচালনিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।

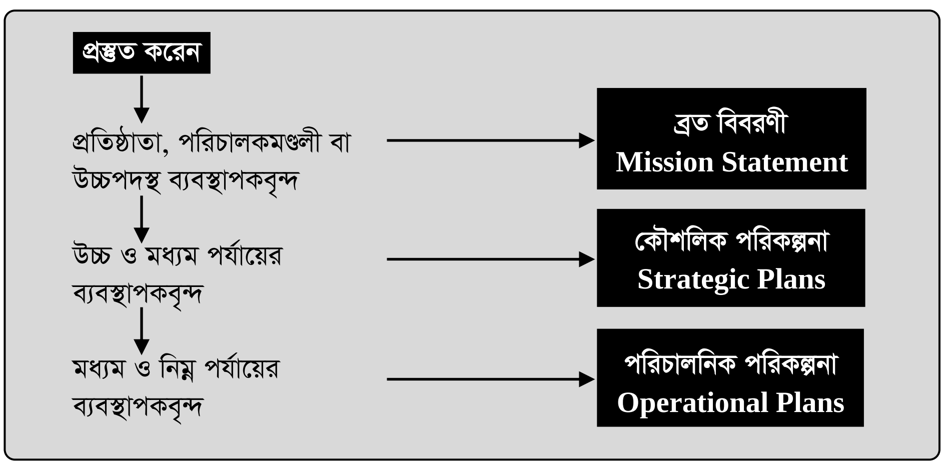

চিত্র ৪.৩: পরিকল্পনার স্তর

পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ
Classification of plans

একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে প্রণীত পরিকল্পনাসমূহকে প্রধানত দুটি ভিত্তিতে ভাগ করা যায়:

- ভিত্তি ১: ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কর্মপন্থা।
- ভিত্তি ২: পরিকল্পনার মেয়াদ বা সময়।

ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কর্মপন্থার ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা প্রধানত আট প্রকার:

১. ব্রত
২. লক্ষ্য ও অভিলক্ষ্য
৩. কৌশল
৪. পলিসি
৫. কার্যপ্রণালি
৬. নিয়মাবলি
৭. কর্মসূচি
৮. বাজেট

এ আট প্রকার পরিকল্পনার মধ্যে ক্রমধারাভিত্তিক যোগসূত্র রয়েছে। যেমন- প্রথমেই প্রতিষ্ঠানের ব্রত নির্ধারণ করার পর ব্রতের সাথে সংগতি রেখে লক্ষ্য নিরূপণ করা হয়। লক্ষ্যের আলোকে বিভিন্ন কৌশল এবং পরবর্তী ধাপে কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যথাক্রমে পলিসি, কার্যপ্রণালি ও কর্মসূচি তৈরি করা হয়। কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে যথাযোগ্য বাজেট প্রণয়ন করা হয় (চিত্র ৪.৪)।

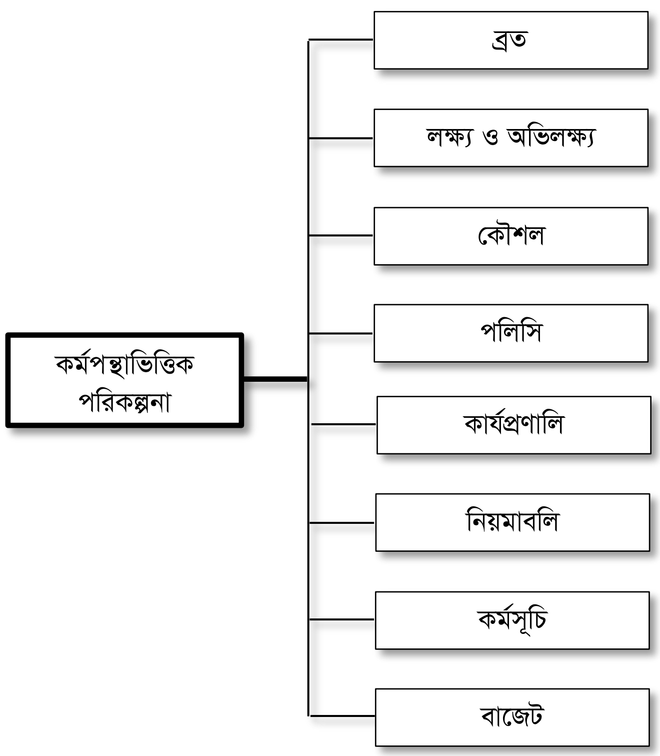

চিত্র ৪.৪: ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কর্মপন্থার ভিত্তিতে প্রণীত বিভিন্ন শ্রেণির পরিকল্পনা

পক্ষান্তরে, সময়ের ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা দুপ্রকার:

ক	একার্থক/অস্থায়ী পরিকল্পনা
খ	স্থায়ী পরিকল্পনা

সময়ের ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আসুন আগে জেনে নেই ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কর্মপন্থার ভিত্তিতে প্রণীত আট প্রকার পরিকল্পনা সম্পর্কে।

(১) **ব্রত (Mission):** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই একটি ব্রত থাকা বাঞ্ছনীয়। কারবারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্রত হলো পণ্য এবং সেবার উৎপাদন ও বন্টন। রাষ্ট্রীয় সড়ক ও জনপথ বিভাগের ব্রত হলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সড়ক ও জনপথ তৈরি ও রক্ষণারেক্ষণ করা। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রত হচ্ছে শিক্ষাদানের পাশাপাশি গবেষণা কার্য পরিচালনা। অনুরূপভাবে একটি আদলিতের ব্রত হচ্ছে ব্যাখ্যাসহকারে আইনের প্রয়োগ। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন, এর একটি ব্রত থাকতেই হবে। 'লক্ষ্যমালা' (objectives) প্রণয়নের জন্য ব্রত বা উদ্দেশ্য অপরিহার্য। প্রত্যেক কারবারি প্রতিষ্ঠানেরই এ প্রশ্নটির উত্তর জানা একান্ত প্রয়োজন – আমাদের ব্যবসায়ের ধরন কী এবং এটি কীরূপ হওয়া আমাদের কাম্য? কারবারি প্রতিষ্ঠানকে প্রথমেই নির্ধারণ করতে পাবে – (ক) তার গ্রাহক কারা এবং (খ) তাদের মনোভাব ও প্রত্যাশা কী। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরও প্রকৃতপক্ষে 'গ্রাহক' রয়েছে। সরকারি এজেন্সির গ্রাহক হলো 'জনগণ' এবং একটি এনজিও-র গ্রাহক হলো মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। অনেক সময় মনে করা হয় যে, কারবারের ব্রত হলো মুনাফা অর্জন করা। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই টিকে থাকার জন্য মুনাফা অর্জনের প্রয়াস নিতে হবে, তা ঠিক। কিন্তু বিশেষ একটি ব্রতকে সামনে রেখেই মুনাফার লক্ষ্য হাসিল করতে হয়। পিয়ার্স ও ডেভিড (Pearce and David) ব্রত-এর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন তাদের ১৯৮৭ সালের একটি প্রবন্ধে। তাঁদের মতে, একটি প্রতিষ্ঠানের ব্রত হলোঃ A statement of its fundamental, unique purpose that sets a business apart from other firms of its type and identifies the scope of the business`s operations in product and market terms. ব্রত বিবরণীর মধ্যে কমপক্ষে তিনটি উপাদান থাকতে হবেঃ (ক) প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য- অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের আকাঙ্খা কী, কী করতে চায়, কী কী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কর্মকাণ্ড চালাতে চায়; (খ) প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ (values) অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান কী মূল্যবোধ/বিশ্বাস ধারণ করে (যেমন- "আমাদের কোম্পানি বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষেরই নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন পণ্য খরিদ করার মৌলিক অধিকার রয়েছে"); এবং (গ) প্রতিষ্ঠানের ধরন বা প্রকৃতি (nature), অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান কী ধরনের ব্যবসায়ে বা কর্মকাণ্ডে জড়িত।

(২) **অভিলক্ষ্য (Goal):** অনেক গ্রন্থকার ও ব্যবস্থাপক অভিলক্ষ্য ও লক্ষ্য (objectives) – এ দুটি পদবাচ্যকে একই অর্থবোধক মনে করেন। আবার কেউ কেউ এ দুটির মধ্যে অর্থগত ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য আছে বলে মনে করেন এবং অভিলক্ষ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য পরামর্শ দেন। অত্র গ্রন্থকারও অভিলক্ষ্য ও লক্ষ্য আলাদা বিষয় বলে মনে করেন, যদিও দুটির মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে অভিলক্ষ্য ও লক্ষ্যকে যদি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে 'লক্ষ্য' শব্দটির ব্যবহারই শ্রেয় বলে মনে হয়।

অভিলক্ষ্যের উদাহরণ: "এক বছরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রশাসনিক ব্যয় কমাতে হবে।" অথবা "পরবর্তী বছরে আগের বছরের তুলনায় মুনাফা বৃদ্ধি করা হবে।" খেয়াল করুন, ওপরের দুটি উদাহরণে কোনো কথাই সুনির্দিষ্ট নয় এবং পরিমাপযোগ্যও নয়। তাই অভলক্ষ্য থেকে পরিষ্কার দিক-নির্দেশনা পাওয়া কঠিন। কিন্তু 'লক্ষ্য' এরূপ নয়। তাহলে লক্ষ্য কী?

লক্ষ্য (objectives): লক্ষ্য হলো একটি গন্তব্যস্থল যেখানে পৌঁছার জন্য প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়। প্রত্যেক কর্মীর প্রত্যেকটা কাজেরই লক্ষ্য থাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা। এ গন্তব্যস্থলই হলো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। Koontz, O'Donnel এবং Weihrich- এর মতে, লক্ষ্য হলো "The ends toward which organization and individual activities are directed." অর্থাৎ "লক্ষ্যমালা পরিকল্পন প্রক্রিয়ার শেষ বিন্দুকে নির্দেশ করে; আর এ বিন্দুতে পৌঁছার জন্য সংগঠিতকরণ, কর্মী সংগ্রহ, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলি পরিচালিত হয়।"

অভিলক্ষ্য (goal) ও লক্ষ্য (objectives) – এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে ভালোভাবে বোঝা যাবে।

অভিলক্ষ্যের উদাহরণ:

■ আগামী বছর প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কমাতে হবে (To reduce cost in the next year)। এই অভিলক্ষ্যের ভিত্তিতে একাধিক 'লক্ষ্য' নির্ধারণ করা যায়।

লক্ষ্যের উদাহরণ:

■ ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যয় ১০% কমাতে হবে।

■ ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় ৫% কমাতে হবে।

লক্ষ্য করুন, অভিলক্ষ্য সুনির্দিষ্ট নয়। কত সময়ের মধ্যে কী পরিমাণ ব্যয় কমাতে হবে তা বলা নেই। তাই অভিলক্ষ্য পরিমাপযোগ্য (measurable) নয়; এমনকি সংখ্যায় প্রকাশযোগ্যও (quantifiable) নয় । পক্ষান্তরে, লক্ষ্য সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য এবং সে-কারণে মেয়াদান্ত পরিমাপযোগ্য। ৩১শে ডিসেম্বরের পর বলা যাবে, লক্ষ্য অর্জিত হলো অথবা হলো না। কিন্তু অভিলক্ষ্যের বেলায় নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যাবে না।

বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবোচিত লক্ষ্য প্রণয়ন করার সময় মনে রাখতে হবে, এটিতে যেন কমপক্ষে পাঁচটি উপাদান থাকে, যা ৪.৫নং চিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সবগুলো উপাদান ইংরেজি অক্ষর অনুযায়ী বলা যায় SMART (S = Specific; M = Measurable; A = Appropriate; R = Realistic; T = Timebound).

লক্ষ্য অবশ্যই SMART হতে হবে
OBJECTIVES MUST BE SMART

S = Specific	সুনির্দিষ্ট	Specific as to mission and needs
M = Measurable	পরিমাপযোগ্য	Quantifiable, so that end results can be measured.
A = Appropriate	যথোপযুক্ত	Appropriate to resources, technology and environment.
R = Realistic	বাস্তবসম্মত/অর্জনযোগ্য	Achievable within the time limit with the available facilities
T = Timebound	নির্দিষ্ট সময়	Specified time for completion.

চিত্র ৪.৫: বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রণীত লক্ষ্যের পাঁচটি উপাদান

লক্ষ্যমালায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত চূড়ান্ত ফল বর্ণিত থাকে। মূল লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার জন্য অনেকগুলো গৌণলক্ষ্য প্রণীত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহ একটি স্তর (hierarchy) বা নেটওয়ার্কের সৃষ্টি করে। ৪.৬ চিত্রটি দেখুন।

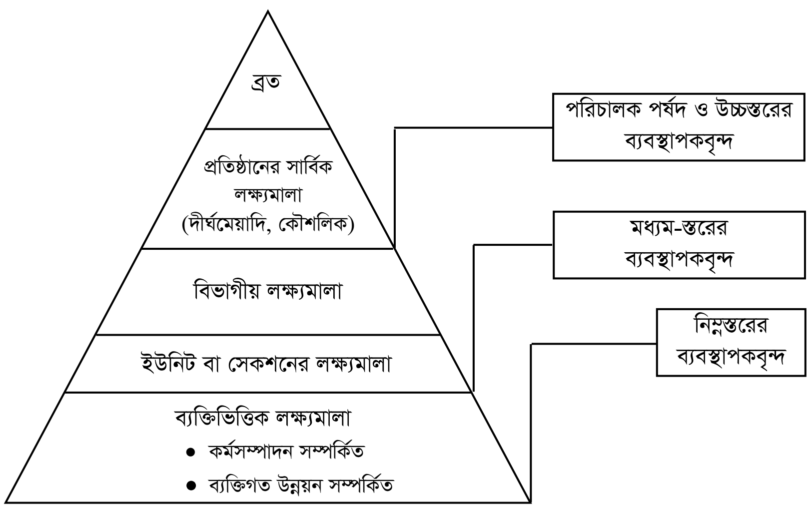

চিত্র ৪.৬: লক্ষ্যমালার স্তর (Hierarchy of objectives)

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সাংগঠনিক স্তরের ব্যবস্থাপকেরা বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত। পরিচালকগণ এবং উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকেরা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, সার্বিক লক্ষ্যমালা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমালা নির্ধারণের সাথে জড়িত। পক্ষান্তরে, মধ্যমস্তরের ব্যবস্থাপকবৃন্দ (যেমন – ভাইস প্রেসিডেন্ট বা উৎপাদন বিভাগের ব্যবস্থাপক, বিক্রয় বিভাগের ব্যবস্থাপক) বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ নিরূপণ করে থাকেন। নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপকদের প্রধান দায়িত্ব হলো বিভাগীয় স্তরের লক্ষ্য ছাড়াও তাদের অধীনস্থ কর্মীদের নিজ নিজ লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করা।

৩ **কৌশল (Strategy):** কৌশল বলতে সাধারণত কোনো কর্মপন্থার সাধারণ কর্মসূচিকে বোঝায় যেখানে লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। Chandler বলেন, **"কৌশল হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের মৌলিক দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমালা নির্ধারণ এবং এসব লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে কর্মপন্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থাকরণ।"** Newman- এর মতে, **"কৌশল হলো সঠিক সম্পদ সঠিক স্থানে সঠিক সময়ে প্রাপ্তির ব্যবস্থা সম্বলিত পরিকল্পনা।"** কৌশল ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় এটিকে এক প্রকার পরিকল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে কী ধরনের দেখতে চাই তার একটি মানসিক ছবি কৌশল-এর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। কীভাবে সমতাপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হবে, সম্পদ ব্যবহার করা হবে এবং কোন কাজের ওপর কখন কীরূপ গুরুত্ব প্রদান করা হবে ইত্যাদি কৌশল-এর মধ্যে নির্ধারিত থাকে।

৪ **পলিসি (Policy):** পলিসি এক প্রকার পরিকল্পনা। এরূপ পরিকল্পনা কতিপয় সাধারণ বিবরণীর সমাহার যা সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে চিন্তাভাবনাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পলিসি নির্ধারণ করেন। পলিসিতে যা বলা থাকে কর্মকর্তা-কর্মচরীরা তদানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকেন। যেমন, একটি কোম্পানির একটি পলিসি এমন হতে পারে- "কোম্পানির কোনো কর্মী কাঁচামাল সরবরাহকারীর নিকট থেকে গিফট বা উপহার নিতে পারবে না।" এরূপ পলিসি থাকার কারণ কোনো কর্মী উপহার গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। পলিসি সব সময় 'বিবরণী' হিসেবে থাকবে এমন কোনো কথা নেই। উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তার কার্যাবলি থেকেও পলিসি উদ্ভূত হতে পারে। যেমন, যদি একজন ব্যবস্থাপক সব সময় কর্মীদের মধ্য থেকে পদোন্নতি-নীতি অনুসরণ করেন, তাহলে অন্যান্যরাও এটিকে একটি পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। জর্জ টেরীর মতে, A policy is a verbal, written of implied over all guide setting up boundaries that supply the general limits and derection in which managerial action will tatke place.

পলিসি একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয় যার ভেতরে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, যাতে লক্ষ্যমালার সাথে সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। পলিসি বিভিন্ন ইস্যুকে পূর্ব-নির্ধারিত করে দেয় বলে একই ইস্যুকে বার বার বিশ্লেষণ করতে হয় না। সবাই ইস্যুভিত্তিক ঐক্য-মতে থাকতে পারে। পলিসি অন্যান্য প্রকারের পরিকল্পনার জন্যও একটা সমরূপ কাঠামো সৃষ্টি করে। এর দরুন ব্যবস্থাপকেরা নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রেখেই অন্যের নিকট কর্তৃত্ব অর্পণ করতে পারেন।

৫ **কার্যপ্রণালি (Procedures):** কার্যপ্রণালিকে পরিকল্পনা বলা হয় এজন্য যে, কার্যপ্রণালি ভবিষ্যত কার্যাবলি পরিচালনা করার প্রথাগত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুতপক্ষে কার্যপ্রণালি হলো কার্যের জন্য পথনির্দেশ (guides ot action)। পলিসির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, পলিসি চিন্তনের জন্য পথনির্দেশ দেয় (guides ot thinking)। কার্যপ্রণালির ক্ষেত্রে কার্যাবলি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হওয়ার পথ সুগম করে। একটি বিশেষ কার্য কীভাবে সম্পাদিত হবে (বা হওয়া বাঞ্ছনীয়) তৎসম্পর্কে সঠিক পন্থার সন্ধান দেওয়াই হলো কার্যপ্রণালির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের ধারাবাহিক গতিপথ নির্দেশ করার মধ্যে কার্যপ্রণালির গুরুত্ব নিহিত।

পুরো প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন কার্যপ্রণালি-বিধি থাকতে পারে, তেমনি প্রত্যেক বিভাগ বা সেকশনের জন্যও আলাদা কার্যপ্রণালি-বিধি থাকতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো বিভাগ থাকলে কার্যপ্রণালি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিল্পকারখানায় ফরমায়েশ (মালের অর্ডার) সম্পর্কিত কার্যপ্রণালি কয়েকটি বিভাগের সাথে জড়িত হতে পারে, বিক্রয় বিভাগ (মূল ফরমায়েশের জন্য), অর্থ বিভাগ (অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য), হিসাব বিভাগ (লেনদেন রেকর্ড করার জন্য), উৎপাদন বিভাগ (পণ্য উৎপাদনের অর্ডারের জন্য) এবং পরিবহন বিভাগ (গ্রাহকের নিকট পণ্য প্রেরণের জন্য)।

৬ **নিয়মাবলি (Rules):** একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে কি হবে না, তৎসম্পর্কে যে নিয়মনীতি প্রচলিত থাকে তা নিয়মাবলি নামে পরিচিত। পলিসি এবং কার্যপ্রণালির সাথে নিয়মাবলিকে অনেক সময় ভুলবশত এক করে দেখা হয়। নিয়মাবলি যেহেতু কর্মপন্থার জন্য পথনির্দেশ দান করে সেহেতু এটিকে কার্যপ্রণালির

সাথে সম্পর্কিত বলা যায়। কিন্তু নিয়মাবলি সময়ের ধারাবাহিকতা নির্দিষ্ট করে দেয় না। আসলে কার্যপ্রণালিকে কতিপয় নিয়মাবলির সিকুয়েন্স বা ক্রমধারা হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে একটি 'নিয়ম' কার্যপ্রণালির অংশ হতেও পারে, না-ও হতে পারে। যেমন, 'ধূমপান নিষেধ' কথাটি একটি নিয়ম কিন্তু কার্যপ্রণালির সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই।

(৭) **কর্মসূচি (Programs):** কর্মসূচি হলো অভিলক্ষ্য, পলিসি, কার্যপ্রণালি, নিয়মাবলি, কর্মভার, গৃহীতব্য পদক্ষেপ, ব্যবহারযোগ্য সম্পদ এবং নির্দিষ্ট কর্মপন্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণের সমষ্টি। কর্মসূচি বৃহদাকারের কিংবা ক্ষুদ্রাকারের যে-কোনো প্রকার হতে পারে। একটি কোম্পানি যদি নির্বাহী প্রশিক্ষণের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করে তাহলে সেটি হবে একটি বৃহদাকার কর্মসূচি। আর যদি কোম্পানির উৎপাদন বিভাগের একজন সুপারভাইজার শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে, তা হবে ক্ষুদ্রাকার কর্মসূচি।

(৮) **বাজেট (Budget):** বাজেটও এক প্রকার পরিকল্পনা। বাজেট হলো সংখ্যায় প্রকাশিত প্রত্যাশিত ফলাফলের একটি বিবরণী। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই মুনাফা অর্জন এবং পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বণ্টনের একটা প্রত্যাশা থাকে। ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মাধ্যমে কী ফলাফল পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবস্থাপকগণ আগেভাগে একটা পরিকল্পনা তৈরি করেন। এ পরিকল্পনায় সবকিছু সংখ্যায় (যেমন, টাকা বা ইউনিট) প্রকাশ করা হয়। পরিকল্পনা যখন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তখনই তা বাজেট নামে পরিচিত হয়। আগামী এক বছরে (সময় কম-বেশি হতে পারে) প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত নগদ অর্থের আগমন কীরূপ হবে, খরচ ও আয় কত হবে মূলধনী ব্যয় কী পরিমাণে হতে পারে কিংবা শ্রমঘণ্টা ব্যবহারের ধরন কীরূপ হবে – এসব তথ্যাবলি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাজেটে যে হিসাব দেওয়া থাকে তদনুযায়ী ফল পাওয়া যাচ্ছে কি না, তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা যায়। তাই বাজেট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য যে কোনো 'আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বা 'ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান' এর বই দেখুন।]

সময়ের ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা

Time/duration based plans

সময়ের ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা দুপ্রকার:

(১) একার্থক বা অস্থায়ী পরিকল্পনা (Single-use plan) এবং

(২) স্থায়ী পরিকল্পনা (Standing plan)।

একার্থক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়

What is single-use plan

একটি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানকল্পে অথবা বিশেষ কোনো ঘটনা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে যখন বিশেষ ধরনের অস্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে একার্থক পরিকল্পনা বলে। এটি অস্থায়ী পরিকল্পনা নামেও পরিচিত। এরূপ পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, সে উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পর পরিকল্পনাটির উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়। এ ধরনের পরিকল্পনা বার বার ব্যবহার করা হয় না।

একার্থক পরিকল্পনার সুবিধাবলি

একার্থক পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলি সম্পাদনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিশেষ কোনো ঘটনার সৃষ্টি হলে সেই ঘটনা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে একার্থক পরিকল্পনা প্রণীত হয় বলে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথে জড়িত সমস্যাদি সহজেই চিহ্নিত করা যায় এবং প্রতিকারও সহজেই খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হয়।

একার্থক পরিকল্পনা সাধারণত, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সংকটকে চিন্তাধারায় রেখে প্রণয়ন করা হয়। সেজন্য ভবিষ্যতে যখন পূর্বকল্পিত সংকটের সৃষ্টি হয়, তখন একার্থক পরিকল্পনার মাধ্যমে এর সমাধানের প্রচেষ্টা নেওয়া সম্ভব হয়।

একার্থক পরিকল্পনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিলম্বতা পরিহার করা যায়। যখনই কোনো সংকটের সৃষ্টি হয় তখনই এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে একার্থক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ফলে ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই কালবিলম্ব না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

একার্থক পরিকল্পনা যেহেতু বিশেষ বিশেষ সংকট বা সমস্যার সাথে জড়িত, সেহেতু এ পরিকল্পনার মাধ্যমে অধিকতর দক্ষ এবং কার্যকর কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভবপর। উন্নততর কর্ম পদ্ধতি বিকাশের কারণে প্রতিষ্ঠানের কাজে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়।

একার্থক পরিকল্পনা কর্তৃত্ব অর্পণ সহজতর করে। একটি প্রতিষ্ঠানে যখন কাজের পরিধি বেড়ে যায় তখন ব্যবস্থাপকদের কাজের ভার লাঘব করার জন্য নিজের কর্তৃত্বের কিছু অংশ অন্যের নিকট অর্পণ করা হয়। একার্থক পরিকল্পনায় এরূপ কর্তৃত্ব অর্পণ সহজতর হয়।

একার্থক পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রণ কার্য সহজতর করা সম্ভবপর হয়। কারণ একার্থক পরিকল্পনায় যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ঐ সব বিষয় তাৎক্ষণিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিধায় ব্যবস্থাপকগণ সহজেই বাস্তবতার সাথে সংগতি রেখে নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করতে পারেন।

স্থায়ী পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়
What is standing plan

একটি প্রতিষ্ঠানে যখন কোনো একটি উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পন, একই ধরনের ক্ষেত্রে বার বার ব্যবহার করা হয়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে। সাধারণত যে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, প্রায় একই প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে বিভিন্ন সময়ে একই পরিকল্পনা বিনা পরিবর্তনে ব্যবহার করা হয়। সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্যাদির ক্ষেত্রে একই প্রকার পরিকল্পনা পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা হয় বলে একে স্থায়ী পরিকল্পনা বলা হয়। স্থায়ী পরিকল্পনার তিনটি উপাদান রয়েছে: (ক) নীতি একটি প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনায় পথনির্দেশ করে; (খ) নীতি বিভিন্ন বিভাগের এবং কর্মীদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে; (গ) নীতি থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানে কার্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে; (ঘ) নীতি কর্মীদের নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে পদোন্নতি, স্থানান্তর, ছাঁটাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নির্দিষ্ট কার্যধারা: নির্দিষ্ট কার্যধারা বলতে প্রতিষ্ঠানের কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে বোঝায়। বিভিন্ন কর্মীরা যে সব কাজ সম্পাদন করে সেগুলোর সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্য কাজের স্থায়ী কার্যধারা থাকে।

নির্দিষ্ট কার্য পদ্ধতি: কাজের পদ্ধতি হলো সত্যিকার অর্থে কর্মসম্পাদানের প্রক্রিয়া। বস্তুতপক্ষে পদ্ধতি হলো নির্ধারিত পন্থা যা কর্ম সম্পাদনের জন্য অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

স্থায়ী পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

একজন ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী স্থায়ী পরিকল্পনা ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে উপকার পেতে পারেন। স্থায়ী পরিকল্পনা ব্যবহার করা হলে তিনি সহজে কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে পারেন, কোনো বিশেষ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য একই উৎকৃষ্ট কৌশল বার বার ব্যবহার করতে পারেন, কর্মীদেরকে সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন এবং এমনিতরো আরও অনেক সুবিধা ভোগ করতে পারেন। স্থায়ী পরিকল্পনার সুবিধাগুলোকে আমরা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারি।

স্থায়ী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একই পরিকল্পনা বার বার ব্যবহার করার ফলে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পায়। ফলে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকগণ সহজেই তাদের ওপর অর্পিত কর্তৃত্বের কিছু কিছু অংশ অধীনস্থদের নিকট হস্তান্তর করতে পারেন।

ব্যাপকভাবে কর্তৃত্ব অর্পণ করার ফলে উচ্চ পদে আসীন কর্মকর্তারা অনেকটা কর্মভারমুক্ত হবার সুযোগ পান। কর্মভার কম থাকলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কার্যে তারা বেশি সময় দিতে পারেন।

স্থায়ী পরিকল্পনায় একটি বিশেষ কাজ সম্পদন করার জন্য একই কৌশল বা পদ্ধতি বার বার প্রয়োগ করা হয়। এভাবে 'উৎকৃষ্ট কৌশল বা পন্থা' নির্ধারণ করা সহজ হয়। উৎকৃষ্ট পন্থার ব্যাপক ব্যবহার মিতব্যয়িতা অর্জনের সহায়ক।

উচ্চস্তরের নির্বাহীরা স্থায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কার্য সহজতর করতে পারেন। বার বার একই রীতি-পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে কার্যসম্পাদনের একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় – যা নিয়ন্ত্রণ কার্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিকল্পনা মোতাবেক নির্বাহীগণকে কাজ করতে গিয়ে বার বার নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। একইরূপ সমস্যা দেখা দিলে তারা স্থায়ী পরিকল্পনা প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে পারেন।

স্থায়ী পরিকল্পনা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করে। কম দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদেরকেও সহজে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। পরিকল্পনার নির্ধারিত বিষয়গুলো তাদেরকে শিখিয়ে দিলেই পুনঃপুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা পুরো বিষয় আয়ত্ত করে নিতে পারে।

উল্লেখ্য যে, স্থায়ী পরিকল্পনা ব্যবহার তেমন কোনো অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় না। তবে অনেকে মনে করেন যে, একই পরিকল্পনা বার বার ব্যবহার করা হলে সেটির উন্নতিবিধানের জন্য কেউ সহজে সচেষ্ট হয় না।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাধারণত দুপ্রকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়: (১) কৌশলিক পরিকল্পনা ও (২) পরিচালনিক পরিকল্পনা। কোনো কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে উভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আরেকটি পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়-এর নাম টেকটিক্যাল পরিকল্পনা। কৌশলিক এবং পরিচালনিক পরিকল্পনাগুলোকে স্তরের মাধ্যমে বিন্যাস করে সাজানো হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে প্রণীত পরিকল্পনাসমূহকে প্রধানত দুটি ভিত্তিতে ভাগ করা যায়: ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কর্মপন্থা ও পরিকল্পনার মেয়াদ বা সময়। সময়ের ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা দুপ্রকার: একার্থক বা অস্থায়ী পরিকল্পনা এবং স্থায়ী পরিকল্পনা। একটি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানকল্পে অথবা বিশেষ কোনো ঘটনা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে যখন বিশেষ ধরনের অস্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে একার্থক পরিকল্পনা বলে। একটি প্রতিষ্ঠানে যখন কোনো একটি উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পন, একই ধরনের ক্ষেত্রে বার বার ব্যবহার করা হয়, তাকে স্থায়ী পরিকল্পনা বলে।

পাঠ ৪.৫ ব্যবস্থাপনার স্তরভিত্তিক পরিকল্পনা

Plans of Different levels of Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- টেকটিক্যাল পরিকল্পনা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিচালনিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সময়ের ভিত্তিতে তৈরি করা বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাধারণত দুপ্রকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়: (১) কৌশলিক পরিকল্পনা (strategic Plans) ও (২) পরিচালনিক পরিকল্পনা (operational plans)। উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকেরা কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এরূপ পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্যসমূহ (goals) ও লক্ষ্যমালাকে সার্বিকভাবে তুলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কৌশলিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনাসমূহ পরিচালনিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করার জন্য কীভাবে পণ্য বাজারে উপস্থাপন করা হবে, তা বিবেচনায় রেখে ফিলিপস-এর কৌশলিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে; কিন্তু পরিচালনিক পরিকল্পনায় বিধৃত করা হয়েছে কী কী উপায়ে উৎপাদনের মান কাম্য পর্যায়ে রাখা হবে, মেশিনের মেরামত করা হবে এবং 'প্যাকেজিং'-এর আধুনিকীকরণ করা হবে। কোনো কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে উভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আরেকটি পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়- এর নাম টেকটিক্যাল পরিকল্পনা (tactical plans)। আসুন জেনে নেই ব্যবস্থাপনার স্তরভিত্তিক পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে।

স্তরভিত্তিক পরিকল্পনা

Levels of plan

আমরা জানি, ব্যবস্থাপনার তিনটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। এসব স্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। স্তরের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তিন প্রকার। স্তরভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য নিচের চিত্রটি দেখুন।

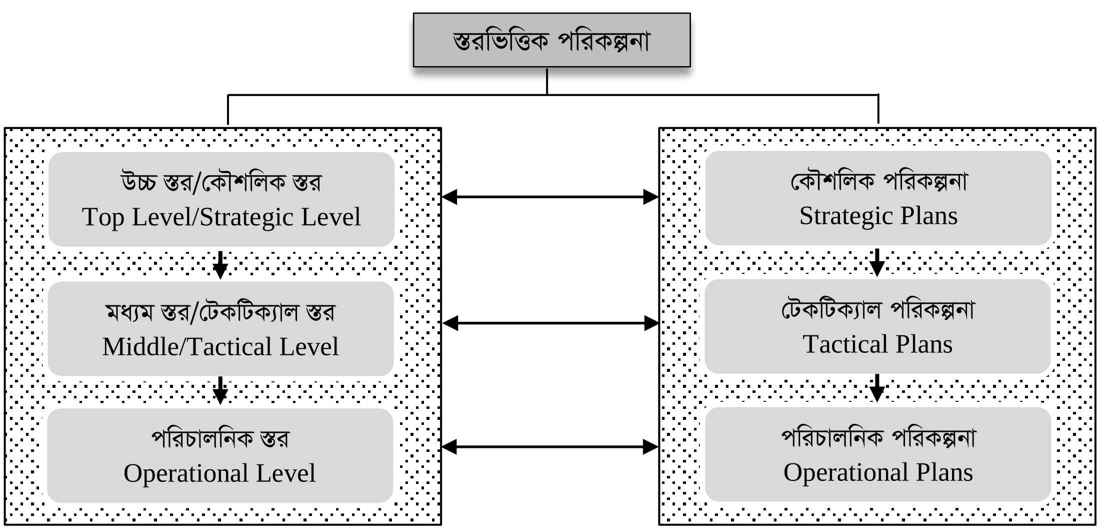

চিত্র ৪.৭: বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা

১ **কৌশলিক পরিকল্পনা:** কৌশলিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, কৌশলিক পরিকল্পনা হলো একটি সাধারণ (general) পরিকল্পনা, যার মধ্যে কৌশলিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সম্পদ বণ্টন, কর্ম-প্রাধিকার (priorities) ও কর্ম পদক্ষেপ (action steps) সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ উল্লিখিত থাকে (a general plan outlining decisions of resource allocation, priorities and action steps necessary to reach strategic goals)। কৌশলিক পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্বে থাকে পরিচালক পর্ষদ ও উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকবৃন্দ। এরূপ পরিকল্পনার সময়ের ব্যাপ্তি হয় ব্যাপক (বেশ কয়েক বছর)। এ ধরনের পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের পরিধি, সম্পদের সঠিক ব্যবহার, প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাবলি এবং সিনার্জীর (synergy) বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়।

[**লক্ষ করুন:** সিনার্জী শব্দটি একটি বিশেষ অবস্থা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে চার না হয়ে তা পাঁচ বা তার অধিক হতে পারে (২ + ২ = ৫....)। এরূপ অবস্থা প্রকাশের জন্য সিনার্জী পদবাচ্যটি ব্যবহার করা হয়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে এর মানে হলো- কোনো পরিকল্পনা বা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজগুলো/কৌশলগুলো আলাদাভাবে সম্পন্ন করা হলে যে ফল পাওয়া যাবে, সবগুলোকে সমন্বিত উপায়ে সম্পন্ন করা হলে তার চেয়ে বেশি ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়টিকে প্রকাশ করা যায় এভাবে: *The whole is greater than the sum of its parts*. উদাহরণ- "মূল্য হ্রাস" কৌশলের ক্ষেত্রে একটি দোকানে যেসব গ্রাহক হ্রাসকৃত মূল্যের পণ্য কেনার জন্য আসেন, তাদের অনেকে সে দোকান থেকে অন্যান্য (স্বাভাবিক মূল্যের) পণ্যও কিনে থাকেন। ফলে দোকানির দ্বিবিধ প্রকারের লাভ হয়। এরূপ লাভ হওয়াকেই বলা হয় সিনার্জী।]

২ **টেক্‌টিক্যাল পরিকল্পনা:** কৌশলিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট অংশ বাস্তবায়নের জন্য টেকটিক্যাল পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে থাকেন সাধারণত মধ্যম স্তরের ব্যবস্থাপকবৃন্দ। কৌশলিক পরিকল্পনার মেয়াদ হয় স্বল্পতর এবং প্রকৃতি হয় অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট। কৌশলিক পরিকল্পনার ফোকাস থাকে মূলত কর্মীবৃন্দ ও কর্মপন্থার ওপর। প্রত্যেকটি কৌশলিক পরিকল্পনা অনেকগুলো টেকটিক্যাল পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

৩ **পরিচালনিক পরিকল্পনা:** নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকেরা তাদের ব্যবহারের জন্য পরিচালনিক বা অপারেশনাল প্ল্যান তৈরি করেন। টেক্‌টিক্যাল লক্ষ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে স্বল্পমেয়াদি ইস্যুর ভিত্তিতে এরূপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরিচালনিক পরিকল্পনার আওতা সংকীর্ণ হয় এবং এগুলোর ফোকাসও হয় স্বল্পমেয়াদি। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা স্বল্পসংখ্যক কার্যাবলি সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

টেকটিক্যাল পরিকল্পনা থেকে পরিচালনিক পরিকল্পনার উদ্ভব এবং এটি পরিচালনিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পরিচালনিক পরিকল্পনার দুটি প্রধান রূপ হলো: (১) একার্থক পরিকল্পনা (single-use plans) এবং (২) স্থায়ী পরিকল্পনা (standing plans)। একার্থক পরিকল্পনা প্রধানত দুই প্রকার: (ক) কর্মসূচি (program) ও (খ) প্রকল্প (project)। আর, স্থায়ী পরিকল্পনা হয় মূলত তিন ধরনের: (ক) পলিসি, (খ) স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (standard operating procedure) ও (গ) নিয়মাবলি (rules)। চিত্র ৪.৮ লক্ষ করুন।

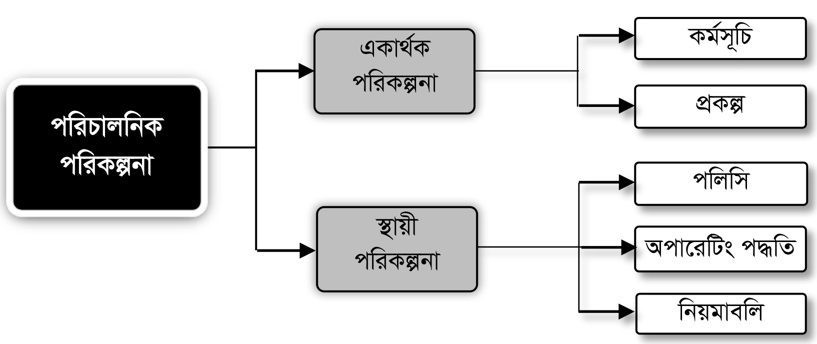

চিত্র ৪.৮: পরিকল্পনার বিভিন্ন রূপ।

পরিকল্পনার সময়সীমা

Time frames of plans

ইতিপূর্বে আমরা যে পরিকল্পনাগুলোর বিষয়ে আলোচানা করেছি, সেগুলোর প্রত্যেকটিরই সময়সীমা রয়েছে। কৌশলিক পরিকল্পনা হয় দীর্ঘমেয়াদি; টেকটিক্যাল পরিকল্পনা হয় মধ্যমমেয়াদি এবং পরিচালনিক পরিকল্পনা হয় স্বল্পমেয়াদি। মেয়াদ অনুযায়ী পরিকল্পনাকে তাই তিনভাগে ভাগ করা যায়:

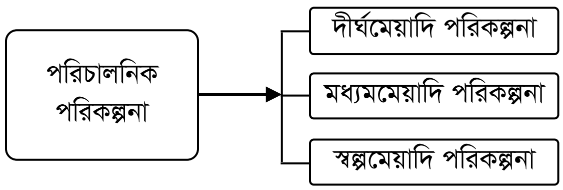

- **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long-term plan):** বেশ কয়েক বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণীত হয়। তবে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, একেক প্রতিষ্ঠানে একেক রকমের হয়ে থাকে। সাধারণত, পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য কোনো পরিকল্পনা তৈরি করা হলে তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত কর হয়। অবশ্য কোনো কোনো বৃহৎ কোম্পানি ১৫/২০ বছরের জন্যও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন ও এক্সন (Exxon) কর্পোরেশনের নাম উল্লেখ করা যায়। জাপানের হিটাচি কোম্পানিও অনুরূপ সময়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
- **মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা (Intermediate-term plan):** দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার তুলানয় মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনার সময় কম হয়। সাধারণত, এক বছর থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাগুলোই হলো মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা। মধ্যম ও প্রথম স্তরের (middle and first-line) ব্যবস্থাপকদের জন্য এরূপ পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- **স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (Short-term plan):** প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো সচরাচর এক বছর মেয়াদি হয়। ব্যবস্থাপকদের দৈনন্দিন কাজগুলোকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা সরাসরি প্রভাবিত করে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দুপ্রকারের হয়:

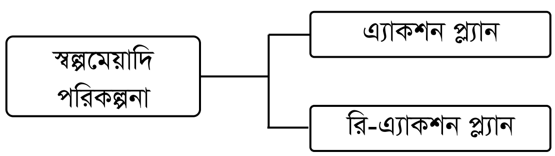

অন্য যে কোনো ধরনের প্ল্যানকে কার্যকর করার জন্য এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়। পক্ষান্তরে, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে সক্ষম পরিকল্পনা হলো রি-এ্যাকশন প্ল্যান।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাধারণত দুপ্রকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়: (১) কৌশলিক পরিকল্পনা ও (২) পরিচালনিক পরিকল্পনা। উচ্চ পদস্থ ব্যবস্থাপকেরা কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এরূপ পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্যসমূহ ও লক্ষ্যমালাকে সার্বিকভাবে তুলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কৌশলিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনাসমূহ পরিচালনিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনো কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে উভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আরেকটি পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়- এর নাম টেকটিক্যাল পরিকল্পনা। কৌশলিক পরিকল্পনা হয় দীর্ঘমেয়াদি; টেকটিক্যাল পরিকল্পনা হয় মধ্যমমেয়াদি এবং পরিচালনিক পরিকল্পনা হয় স্বল্পমেয়াদি।

পাঠ ৪.৬ পরিকল্পন: কৌশল ও কৌশলিক পরিকল্পন

Planning: Strategy and Strategic Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কৌশল কী তা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন পর্যায়ের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৌশল পরিকল্পন কী তা বলতে পারবেন।
- কৌশলিক পরিকল্পন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কৌশল শব্দটি সামরিক প্রশাসনে যুদ্ধ সম্পর্কিত কৌশলগত কোনো দিক বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে কৌশল বলতে রণকৌশলকেই বোঝায়। ব্যবসায়ী জগতে প্রতিযোগিতা মোকবেলা করার জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলোর সাথে রণকৌশলের তাৎপর্যপূর্ণ মিল থাকার কারণে কৌশল পদবাচ্যটিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেও 'কৌশলগত চাতুর্য' অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। কৌশলিক পরিকল্পন সাধারণত দূর ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত। স্বল্প সময়ের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে কৌশলিক পরিকল্পনা বলা যায়। কৌশলিক পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হাসিলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। তাই কৌশলিক পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য। কৌশলিক পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়াই হলো কৌশলিক পরিকল্পনা। এখানে আমরা কৌশল এবং কৌশলিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব।

কৌশল বলতে কী বোঝায়

What is strategy

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এসব সমস্যা সৃষ্টির সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষ জড়িত থাকতে পারে – যেমন, কাঁচামাল সরবরাহকারী, শ্রমিক-কর্মচারী, প্রতিযোগীবৃন্দ, সরকারি সংস্থা, পণ্যের ক্রেতা ইত্যাদি। এদের প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার জন্য আগেভাগেই যেসব প্রতিরোধমূলক বা প্রতিবিধানমূলক কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে কৌশল বলে। কৌশল কথাটি মূলত মিলিটারি প্রশাসনে ব্যবহার করা হতো এবং এখনো করা হয়। মিলিটারি কনসেপ্ট হিসেবে কৌশল শব্দটিকে শত্রুপক্ষকে মোকাবেলা করার কৌশলরূপে ব্যবহার করা হয়। ব্যবসা-প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করার জন্য গৃহীত নীতিমালা বা কর্মপন্থাকে কৌশল নামে অভিহিত করা হয়। আর. এন. এন্থনীর মতে, **সংগঠনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ব্যবহারযোগ্য সম্পদাদি সংগ্রহকরণ ও ব্যবহারকরণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন জাতীয় পলিসি নির্ধারণের প্রক্রিয়া থেকে কৌশলের উদ্ভব হয়। আসলে কৌশল হলো একটি প্রতিষ্ঠানের মৌলিক দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমালা নির্ধারণ এবং এসব লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত কর্মপন্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বিনিয়োজিতকরণ।** এ.ডি. চ্যান্ডলার এর ভাষায়: Strategy is the determination of the basic long term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary to carry out these goals.

একটি প্রতিষ্ঠানের মানব-ছবি কীরূপ তা প্রধান প্রধান লক্ষ্যমালা ও পলিসির একটি সিস্টেমের মাধ্যমে নির্ধারণ ও অবহিত করাই কৌশল-এর মূল উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কীভাবে হাসিল করা হবে তা বিস্তারিতভাবে দেখানোর জন্য কৌশল প্রণয়ন করা হয় না। কারণ এরূপ করা কৌশল-এর উদ্দেশ্য নয়।

কৌশল প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাধারা ও কর্মপন্থাকে সঠিকভাবে পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি প্রয়োজনীয় কাঠামো সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে ব্যবসায় জগতে অধিকাংশ কৌশল-এর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বিবেচ্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে সনাতনী

মিলিটারি কনসেন্টকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৯৫০-এর দশক থেকে জার্মানির ফক্সওয়াগন কোম্পানি আমেরিকার অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে প্রবেশ করার জন্য এক ধরনের স্বল্প-মূল্য বিশিষ্ট গাড়ি রপ্তানির কৌশল অবলম্বন করেছিল। এ গাড়ি আকারে ছোটো, জ্বালানি খরচ হয় কম, জনবহুল এলাকায় চালানো যায় সহজে এবং পার্কিং সহজতর। এ কৌশল-এর মধ্যে সনাতনী মিলিটারি কনসেপ্ট এর সব উপাদানই নিহিত ছিল। যেমন – আমেরিকায় অবস্থিত প্রতিযোগী গাড়ি প্রস্তুতকারীবৃন্দ, সকল প্রতিযোগীকে সন্তুষ্ট করতে পারে এমনতরো বাজারের অভাব এবং একটি শূন্যতা যেখানে ছোটো গাড়ি কেউ তৈরি করছিল না।

বিভিন্ন পর্যায়ের কৌশল

Strategies at different levels

প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন পর্যায়ে কৌশল বিভিন্ন রূপ হতে পারে। সাধারণত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের তিন পর্যায়ে কৌশল থাকতে পারে:

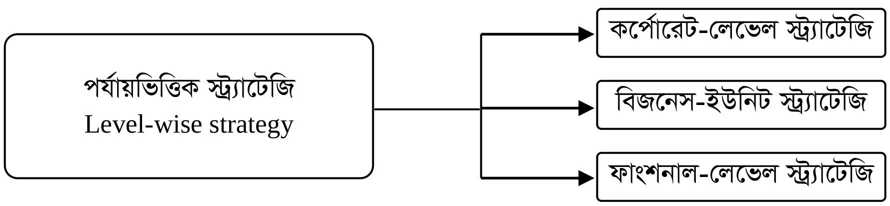

১ **কর্পোরেট-লেভেল স্ট্র্যাটেজি (Corporate-level strategy):** বহুমুখী ব্যবসায়ে জড়িত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নির্বাহ করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকবৃন্দ কর্পোরেট-লেভেল স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করেন। এরূপ স্ট্র্যাটেজি শুধুমাত্র একাধিক ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট (more than one line of business) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ পর্যায়ের স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক প্রশ্নের জবাব খোঁজা হয় সেগুলো হলো: (ক) প্রতিষ্ঠানের কী কী ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকা উচিত? (খ) প্রত্যেক প্রকার ব্যবসায়ের জন্য কী কী অভিলক্ষ্য (goals) থাকবে? (গ) অভিলক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্ত কীভাবে প্রত্যেক প্রকার ব্যবসায়ের জন্য সম্পদ বিনিয়োজিত করা হবে?

২ **বিজনেস-ইউনিট স্ট্র্যাটেজি (Business-unit strategy):** বহুমুখী ব্যবসায়ের মধ্যে একটি মাত্র ব্যবসায়ের (one line of business) সাথে বিজনেস ইউনিট স্ট্র্যাটেজি জড়িত। এরূপ স্ট্র্যাটেজি যেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চায় সেগুলো হলো: (ক) বাজারে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা কীভাবে মোকাবেলা করা হবে? (খ) কী কী পণ্য বাজারে ছাড়া হবে? (গ) কোন ধরনের গ্রাহকের জন্য পণ্য তৈরি করা হবে? (ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়টির জন্য কীভাবে সম্পদ ব্যয় করা হবে?

অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকতে চায়। যেমন, বেক্সিমকো একাধারে ওষুধ, টেক্সটাইল, কম্পিউটার, হাউজিং ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ে জড়িত। এরূপ ব্যবসায়ে উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকদেরকে বহুবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। তারা এরূপ সমস্যা সমাধানের জন্য 'স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট' (Strategic Business Unit – SBU) সৃষ্টি করে। অর্থাৎ একটি পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয় এবং প্রত্যেক ভাগকে 'স্ট্র্যাটেজিক ইউনিট' হিসেবে বিবেচনা করে।

৩ **ফাংশনাল-লেভেল স্ট্র্যাটেজি (Functional-level strategy):** ফাংশনাল-লেভেল স্ট্র্যাটেজি প্রত্যেক কার্যের (যথা- উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি) জড়িত ব্যবস্থাপকের জন্য একটি কাঠামো সৃষ্টি করে যা দিয়ে তিনি বিজনেস ইউনিট স্ট্র্যাটেজী ও কর্পোরেট-লেভেল স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন করতে পারেন। ফাংশনাল-লেভেল স্ট্র্যাটেজি থেকে পরিচালনিক বা অপারেশনাল প্ল্যানের সৃষ্টি হয়।

কৌশলিক পরিকল্পন কী

What is strategic planning

পরিকল্পন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকবৃন্দ দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করে এবং সেগুলো অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করে। এসব পরিকল্পনা কৌশলিক পরিকল্পনা নামে পরিচিত। কৌশলিক পরিকল্পন প্রক্রিয়ার

লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর এর আঙ্গিকে স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কৌশল বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয় (চিত্র ৪.৯ দেখুন)।

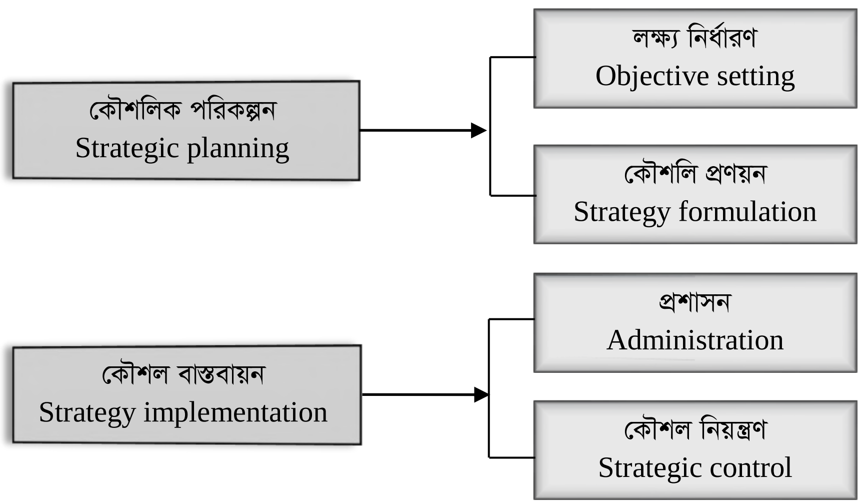

চিত্র ৪.৯: কৌশলিক পরিকল্পন ও কৌশল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

কৌশলিক পরিকল্পনার ফোকাস হলো বাহ্যিক পরিবেশের ওপর বা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে থাকে। কৌশলিক পরিকল্পনা বিদ্যমান থাকলে, বাইরের জগতের যে পরিবেশ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে সেই পরিবেশে কোনোরূপ বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা থাকলে তা আগেভাগে জেনে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া, পরিবেশের মধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার করাও সম্ভব হয়।

কৌশলিক পরিকল্পন থেকে কৌশলিক পরিকল্পনার (Strategic plan) উদ্ভব। উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকেরা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নির্দেশনা প্রদানের জন্য যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করেন, তা কৌশলিক পরিকল্পনা নামে পরিচিত। বৃহত্তর পরিসরে দীর্ঘ সময়ের জন্য এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্রত বা প্রধান অভিলক্ষ্যসমূহের আঙ্গিকে কৌশলিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

কৌশলিক পরিকল্পনের প্রক্রিয়া

Processes of strategic planning

কৌশলিক পরিকল্পন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আপনি কী করবেন? আপনাকে কমপক্ষে ১০ রকমের ১০টি কাজ করতে হবে (চিত্র ৪.১০)। যদিও এসব কাজের কয়েকটি একই সাথে সম্পন্ন করা যায়, তবুও আমরা বোঝার সুবিধার্থে এগুলোকে পরপর আলাদাভাবে আলোচনা করব।

১ম কাজ : আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্রত (মিশন) নির্ধারিত করুন (ব্রত আগে থেকে নির্ধারিত থাকলে, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিমার্জন করুন)।

২য় কাজ : প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের (যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, যেমন- ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ) নিকট থেকে স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার ব্যাপারে অঙ্গীকার আদায় করুন। কারণ তারাই প্রতিষ্ঠানের স্ট্র্যাটেজি ও পলিসি নির্ধারণের দায়িত্বে থাকবেন।

৩য় কাজ : আপনার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক অভিলক্ষ্য (goals) ও লক্ষ্যমালা (objectives) নির্ধারণ করুন।

৪র্থ কাজ : প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সবলতা (strengths) ও দুর্বলতাগুলো (weaknesses) খুঁজে বের করুন।

৫ম কাজ : আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বাহ্যিক পরিবেশের অনুকূল (opportunities) ও প্রতিকূল (threats) উপাদানগুলো সনাক্ত করুন।

৬ষ্ঠ কাজ : ওপরের বিষয়গুলোর আলোকে কৌশলগত বিকল্পগুলো (strategic alternatives) চিহ্নিত করুন।

৭ম কাজ : বিকল্প কর্মপন্থাগুলোর মধ্যে কোনটি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে, তুলনামূলক পর্যালোচনা করুন।

৮ম কাজ : এবার সিদ্ধান্ত নিন কোন বিকল্পটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

৯ম কাজ : সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করুন। স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আপনাকে

- বিস্তারিত প্ল্যান তৈরি করতে হবে।
- পলিসি ঠিক করতে হবে।
- লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

১০ম ও শেষ কাজ : পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা জানার জন্য প্রকৃত কাজের মূল্যায়ন করুন, নিয়ন্ত্রণ করুন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

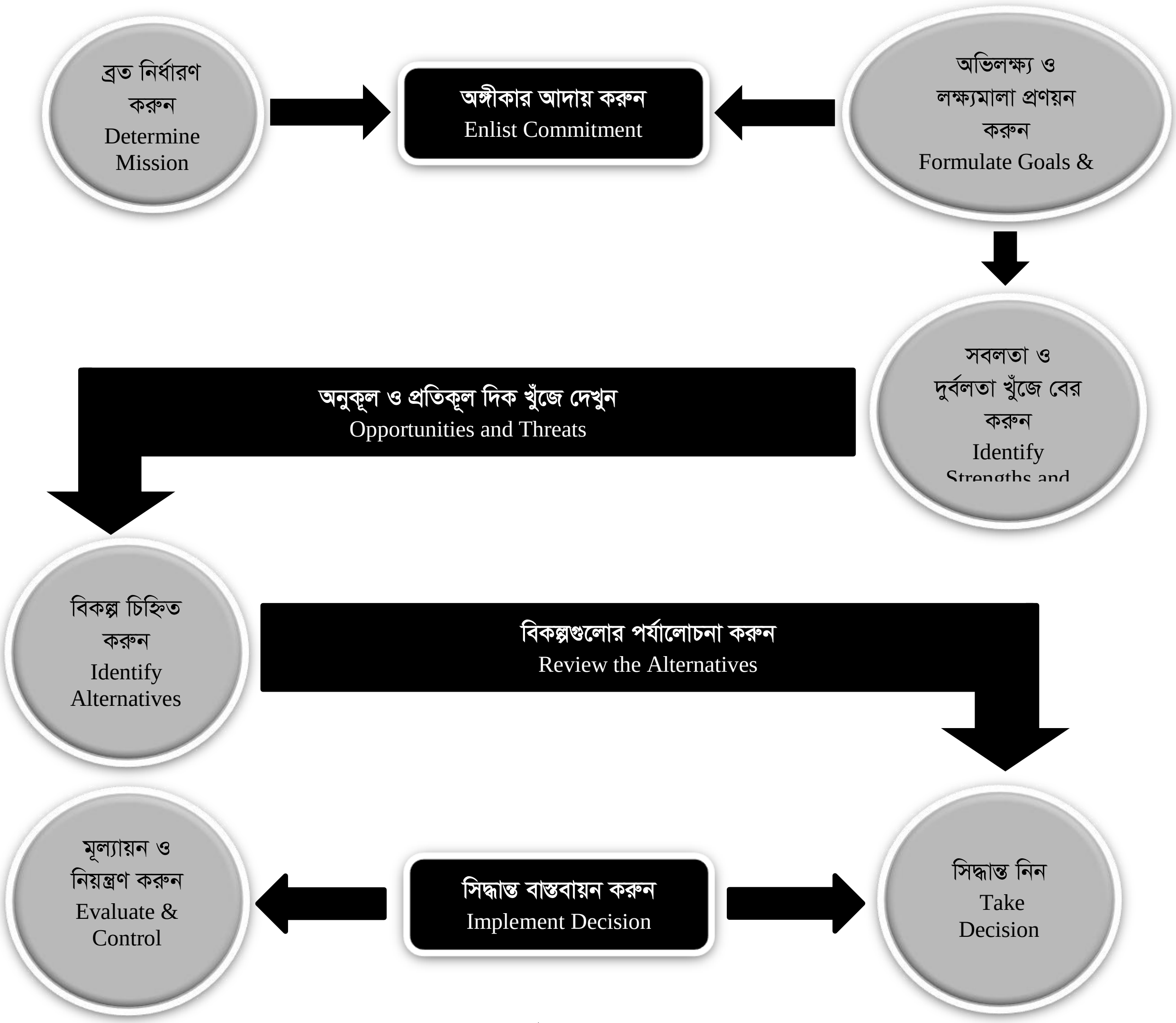

চিত্র ৪.১০: কৌশলিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এদের প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার জন্য আগেভাগেই যেসব প্রতিরোধমূলক বা প্রতিবিধানমূলক কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে কৌশল বলে। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন পর্যায়ে কৌশল বিভিন্ন রূপ হতে পারে। সাধারণত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের তিন পর্যায়ে কৌশল থাকতে পারেঃ কর্পোরেট-লেভেল স্ট্র্যাটেজি, বিজনেস-ইউনিট স্ট্র্যাটেজি এবং ফাংশনাল-লেভেল স্ট্র্যাটেজি। পরিকল্পন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকবৃন্দ দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করে এবং সেগুলো অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করে। এসব পরিকল্পনা কৌশলিক পরিকল্পনা নামে পরিচিত। কৌশলিক পরিকল্পন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর এর আঙ্গিকে স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। কৌশলিক পরিকল্পন থেকে কৌশলিক পরিকল্পনার উদ্ভব। উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপকেরা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নির্দেশনা প্রদানের জন্য যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করেন, তা কৌশলিক পরিকল্পনা নামে পরিচিত। বৃহত্তর পরিসরে দীর্ঘ সময়ের জন্য এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্রত বা প্রধান অভিলক্ষ্যসমূহের আঙ্গিকে কৌশলিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

পাঠ ৪.৭ লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
Management by Objectives

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কী তা বলতে পারবেন।
- লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বা MBO- কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (managementn by results) নামেও পরিচিত। এমবিও- এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ বা ইউনিটের জন্য বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (annual objectives) নির্ধারণ করা হয় না। বরং এর মাধ্যমে প্রত্যেক কর্মীর জন্য অর্জনযোগ্য কর্মসম্পাদনভিত্তিক লক্ষ্য (performance objective) স্থির করা হয়। ১৯৫৮ সালে The Practice of Management নামক গ্রন্থে পিটার ড্রাকার নামে একজন আমেরিকান ব্যবস্থাপনা বিশারদ এ কৌশলের সুপারিশ করেন। সে সময় থেকে এ পর্যন্ত এ বিষয়টির ওপর অনেক আলোচনা, সেমিনার, গবেষণা ও মূল্যায়ন হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার এ কৌশল ফলপ্রসূ হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও এটি প্রত্যাশিত সাফল্য বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রচলিত সে প্রতিষ্ঠানে স্বাভাকিভাবেই এটি সরাসরি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার লক্ষ্যমালা নির্ধারণের সাথে বহুলাংশে জড়িত। এর গুরুত্বের প্রেক্ষিতে আমরা এ পাঠে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (এমবিও) বলতে কী বোঝায়
What is meant by Management By Objectives (MBO)

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বা এমবিও হলো পরিমাপনীয় এবং অংশগ্রহণযোগ্য লক্ষ্যমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাপক সিস্টেম। লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বর্তমান ব্যবস্থাপনা জগতে প্রয়োগকৃত একটি নতুন ব্যবস্থাপকীয় পদ্ধতি। ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও অনেকের কাছেই লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার অর্থ সুস্পষ্ট নয়। কেউ এটাকে একটি মূল্যায়নের কৌশল, কেউ প্রণোদনার কৌশল, আবার কেউ একে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল হিসেবে মনে করেন। এরূপ বহুবিধি অর্থবোধকতার কারণে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞাও পরিস্থিতি এবং সময়ভেদে ভিন্নতর হয়। এ ধারণার (concept) উদ্ভাবন থেকে অদ্যাবধি বেশ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সে সাথে আলোচ্য পদবাচ্যটির অন্তর্নিহিত অর্থের মাত্রাগত রূপটিও পরিবর্তিত হয়ে একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপকীয় সিস্টেমে পরিণত হয়েছে।

সাধারণত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও মূল লক্ষ্যসমূহ উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত হয় এবং তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে গোটা সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের অবহিত করা হয়। অতঃপর এ মূল লক্ষ্যমালাকে প্রয়োজনীয় উপ-লক্ষ্যে (Sub-objective) বিভক্ত করে অধস্তনের ওপর কার্যভার অর্পণ করা হয়। মূল লক্ষ্য হাসিলের উপায় হিসেবে উপ-লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কার্য প্রয়াস চালানো ও কার্যনির্বাহ করাকে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। **গ্রীফিন-** এর মতে, "Management by objectives is the process of collaborative good settting by a manager and subordinate." **Koontz** ও **Weihrich** লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে কিছুটা ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন: "লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (এমবিও) একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপকীয় সিস্টেম যা ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রমসমূহকে সুবিন্যস্তভাবে সমন্বিত করে এবং কার্যকর ও দক্ষতার সাথে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিক লক্ষ্যমালা অর্জনের নিমিত্ত সচেতনতার সাথে প্রয়াস চালায় [Management By Objectives (MBO) is a comprehensive managerial system that integrates many managerial activities in a system that integrates many managerial activities in a systematic

manner, and is conciously directed toward the effective and efficient achievement of organizational and individual objectives.]

এ সংজ্ঞায় লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার দুটি প্রধান উপাদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

(ক) মুখ্য ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রম ও প্রক্রিয়াসমূহকে যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি সিস্টেম হলো এমবিও।

(খ) প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অভিলক্ষ্যসমূহ (goals) ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্য মূল্যায়ন, নির্বাহীদের পারিতোষিক প্রদান, জনশক্তি পরিকল্পন এবং ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন, উন্নয়ন ও প্রসার লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, MBO-কে ব্যবস্থাপনার একটি স্টাইল হিসেবে অভিহিত করা যায়। অনেকে MBO-কে 'কার্যফলের জন্য ব্যবস্থাপনা' (management for results) নামে আখ্যায়িত করেছেন। এমবিও এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ব্যবস্থাপকগণ উত্তমরূপে তাদের কার্য সম্পাদন করতে পারেন-

(ক) যদি তারা তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন;
(খ) যদি তাদের কাজের অগ্রগতি মাঝে মাঝে মূল্যায়ন করা হয় এবং
(গ) যদি প্রয়োজনবোধে বিকল্প সঠিক পন্থা গ্রহণ করা হয়।

MBO-এর তিনটি দিক রয়েছে:

(১) একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্জনের জন্য কর্মীদের (বিশেষ করে ব্যবস্থাপকদের) লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

(২) অগ্রাধিকার (priority)-এর আলোকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন কর্মকাণ্ড চলতে থাকে তখন সময়ে সময়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অগ্রগতি যাচাই করা।

(৩) ফলাফল মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে তা অবহিত করা এবং বিচ্যুতি বা ত্রুটি ধরা পড়লে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সমাধানমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করা।

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়

What steps are involved in the implementation of MBO

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো ধারাবাহিক ও যৌক্তিক কতগুলো পদক্ষেপের সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কার্য প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা। এরূপ প্রক্রিয়াতে সাধারণত চারটি পদক্ষেপ জড়িত থাকে এবং পদক্ষেপগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এটি এমবিও-এর প্রক্রিয়া নামেও পরিচিত। এ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক সূচনা ঘটে সংগঠন কাঠামোতে ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের দ্বারা। প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক প্রথমে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেন যা সংগঠন কাঠামোর নিম্নের স্তরে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং প্রত্যেক স্তরের কর্মীদের ওপর মূল লক্ষ্যের সাপোর্টিভ লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক তা অর্জনের দায়িত্বভার অর্পিত হয়। এমবিও প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো হলো:

(১) লক্ষ্যমালা নির্ধারণ (Setting objectives);
(২) কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (Developing action plans);
(৩) কালান্তিক পর্যালোচনা (Periodic review);
(৪) কার্য মূল্যায়ন (Performance appraisal)।

এ পদক্ষেপগুলো একে অপরের সাথে জড়িত। লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সাফল্য ও বিস্তৃতির জন্য অনুকূল সাংগঠনিক পরিবেশ অত্যাবশ্যক। সঠিকভাবে এ পদক্ষেপগুলো নেওয়া হলে সংগঠনে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সফলতা আসবেই। চিত্র ৪.১১ লক্ষ করুন এবং আসুন লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার চারটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জেনে নেই।

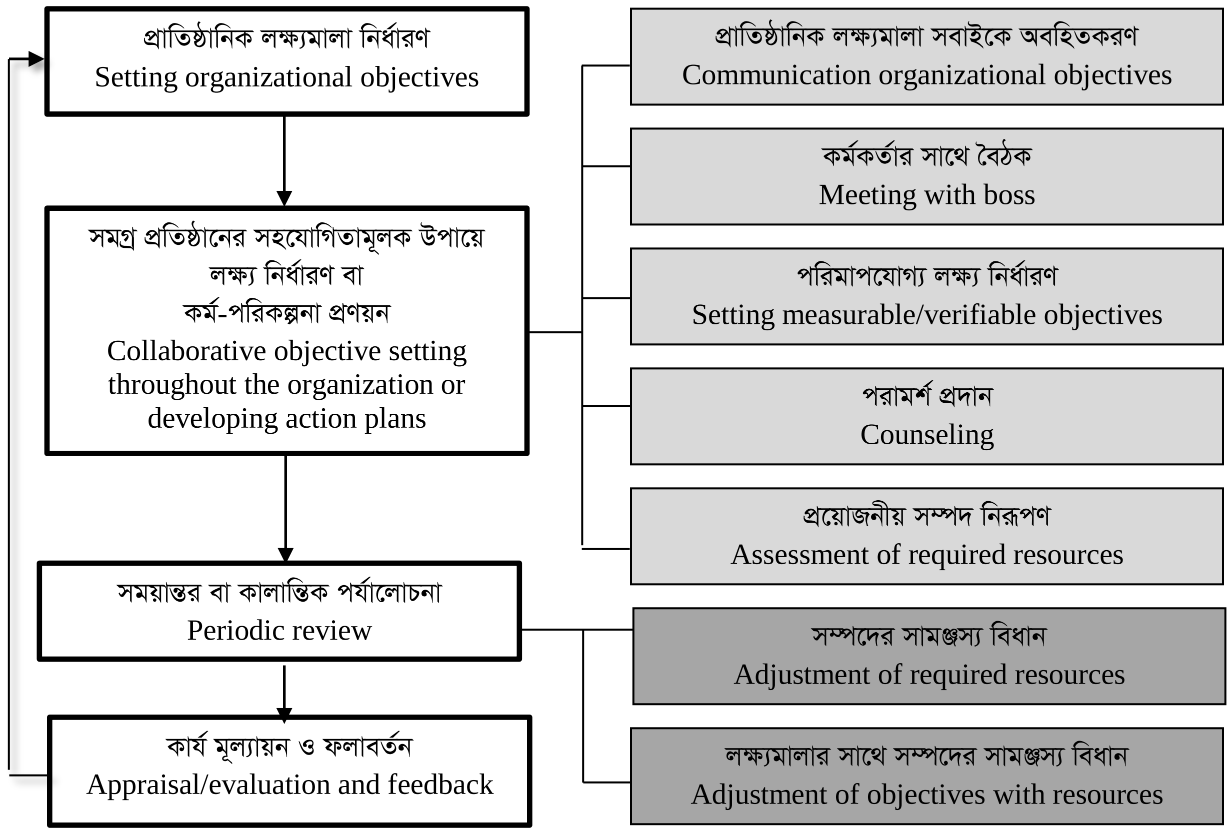

চিত্র ৪.১১: MBO প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ

এ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক সূচনা ঘটে সংগঠন কাঠামোতে ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের দ্বারা। প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক প্রথমে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেন যা সংগঠন কাঠামোর নিম্নের স্তরে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং প্রত্যেক স্তরের কর্মীদের ওপর মূল লক্ষ্যের সাপোর্টিভ লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক তা অর্জনের দায়িত্বভার অর্পিত হয়। নিম্নে এমবিও প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো আলোচিত হলো:

(১) লক্ষ্যমালা নির্ধারণ (Setting objectives): লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সূচনা বিন্দু হলো একটি নির্দিষ্ট ও যথাযথ পরিকল্পনাঙ্গনে সুনির্দিষ্ট এবং প্রতিপাদনীয় লক্ষ্যমালা নির্ধারণ। এ নির্ধারিত লক্ষ্যমালাই এমবিও প্রক্রিয়া চক্রের মূল ভিত্তি এবং অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ এ ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষ্যমালা ব্যবস্থাপকীয় স্তরভিত্তিক কাঠামোর ওপরে প্রথমে নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে পরিসৃত হয়ে নিম্নস্তর অবধি পৌঁছায়। ঊর্ধ্বতন নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আর্থিক ও কারিগরি শক্তি-সামর্থ্যের বিবেচনার প্রেক্ষিতে অর্জনযোগ্য হওয়া আবশ্যক। এজন্য অধীনস্থদের অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপকদের আধিপত্যকারী কিংবা পরিত্যাগকারী ভূমিকার কোনোটাই থাকতে পারবে না। "আমি লিখিত আকারে যা আপনাদেরকে অবহিত করব তাই লক্ষ্য" এরূপ যেমন প্রত্যাশা করা হয় না, তেমনি একজন নিষ্ক্রিয় ব্যবস্থাপকের মত "আপনারা যা লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করবেন তাতেই আমার সায় আছে" এরূপ ভূমিকা কাম্যও নয়। বরং এমবিও তত্ত্বানুযায়ী লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণকালে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়যোগ্য সম্পর্ক বিরাজ করবে।

(২) কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (Developing action plans): প্রাথমিকভাবে গৃহীত লক্ষ্যসমূহ অর্জনার্থে কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যাশিত লক্ষ্যমালা অর্জনের জন্য প্রতিটি স্তরের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অধস্তনদের প্রত্যেকের উপ-লক্ষ্য ও পরিকল্পনা যেন পরস্পরের পরিপূরক হয় এবং কেউ যেন স্ব স্ব উপ-

লক্ষ্যার্জন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কার্যসম্পাদন না করে, এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এজন্য প্রতিটি লক্ষ্য ও উপ-লক্ষ্যার্জনের দায়িত্বভার নির্দিষ্ট কর্মীর ওপর অর্পিত হবে এবং সে মোতাবেক প্রত্যেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

(৩) কালান্তিক পর্যালোচনা (Periodic review): কর্মীরা পরিকল্পনা অনুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো কর্মীদের কার্য মনিটরিং করা। এজন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মীরা নির্দিষ্ট সময় পরপর (যেমন- তিনমাস, ছয়মাস) মিটিং-এ বসে। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য এ কালান্তিক কার্য পর্যালোচনা ও চেক আপের দরুন প্রত্যেক কর্মী তার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং কোনো প্রকার ব্যর্থতা বা ক্রটিবিচ্যুতি শোধরিয়ে নিতে পারে। কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যেমন দায়িত্ব প্রাপ্ত কোনো কর্মীর মৃত্যু কিংবা অনুরূপ কোনো দুর্ঘটনার দরুন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমালা অর্জন ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া, এ পর্যালোচনার দ্বারা কর্মকর্তারা অধস্তনদেরকে ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও অন্যান্য তথ্য আদানপ্রদানে সক্ষম হন।

(৪) কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন (Performance appraisal): এমবিও-এর চূড়ান্ত পদক্ষেপে নির্দিষ্ট মেয়াদের (প্রধানত এক বছর) নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের কার্যমূল্যায়ন করা হয়। নির্ধারিত সময় শেষে কর্মীরা তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব কতটুকু সাফল্যের সাথে পালন করল তা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করার জন্য কর্মকর্তা ও অধস্তনগণ একত্রিত হন। লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় কোনো কর্মী বা ব্যবস্থাপকের ব্যক্তিত্বকে অধিকতর গুরুত্বারোপণ কিংবা কাজের প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রকাশ ইত্যাদির অবকাশ নেই। শুধুমাত্র সম্পাদিত কার্যফলাফল ও মানের নিরিখেই প্রতিটি কর্মীদের মূল্যায়ন করা হয়। প্রত্যাশিত কার্যফলাফল অর্জিত হলে তা স্বীকৃতি ও পুরস্কার স্বরূপ কর্মীদের পদোন্নতি, বোনাস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। আর লক্ষ্যমালা থেকে অর্জিত ফলাফলের নেতিবাচক বিচ্যুতি হলে ভবিষ্যতের জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে হয়। এভাবে এমবিও প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। তৃতীয় ও চতুর্থ পদক্ষেপে কার্য মূল্যায়নকালে কর্মীদেরকে অধিকতর প্রণোদনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আচরণগত নীতিমালাকে বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়:

(ক) **অংশগ্রহণের নীতি (Principle of participation):** সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লক্ষ্যমালা নির্ধারণকালে কর্মীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।

(খ) **ফলাবর্তন নীতি (Principle of feedback):** উপযুক্ত ফলাবর্তনের মাধ্যমে কর্মীদের অবস্থান ও প্রক্রিয়া ব্যক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) **প্রতিদানমূলক স্বার্থ নীতি (Principle of reciprocated interest):** লক্ষ্য এমন হওয়া আবশ্যক যাতে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের মধ্য দিয়েই কর্মীদের ব্যক্তিক লক্ষ্য অর্জিত হয়।

(ঘ) **স্বীকৃতির নীতি (Principle of recognition):** সাংগঠনিক লক্ষ্যার্জনে কর্মীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

সারসংক্ষেপ

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হলো পরিমাপনীয় এবং অংশগ্রহণযোগ্য লক্ষ্যমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাপক সিস্টেম। লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বর্তমান ব্যবস্থাপনা জগতে প্রয়োগকৃত একটি নতুন ব্যবস্থাপকীয় পদ্ধতি। লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো ধারাবাহিক ও যৌক্তিক কতগুলো পদক্ষেপের সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কার্য প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা। এরূপ প্রক্রিয়াতে সাধারণত চারটি পদক্ষেপ জড়িত থাকে এবং পদক্ষেপগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এটি এমবিও-এর প্রক্রিয়া নামেও পরিচিত। এমবিও প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো হলো: লক্ষ্যমালা নির্ধারণ, কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, কালান্তিক পর্যালোচনা এবং কার্য মূল্যায়ন।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. পরিকল্পন বলতে কী বোঝেন? ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলির সাথে পরিকল্পন-এর সম্পর্ক কী?
২. পরিকল্পন-এর সাথে সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক কী? এরূপ সম্পর্ক কি অপরিহার্য?
৩. সাংগঠনিক পরিকল্পনার স্তর সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন। ব্রত বিবরণীর সাথে পরিচালনিক পরিকল্পনার কাঠামোগত সম্পর্ক নিরূপণ করুন।
৪. একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। এগুলো কী কী? ভবিষ্যত গৃহীতব্য কর্মপন্থার ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনাগুলোর বিবরণ দিন।
৫. প্রতিষ্ঠানের ব্রত বলতে কী বোঝেন? ব্রত কেন প্রয়োজন? একটি এনজিও-এর ব্রত বিবরণী তৈরি করুন।
৬. (ক) অভিলক্ষ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
(খ) লক্ষ্য বলতে কী বোঝেন? একটি আদর্শ লক্ষ্যের মধ্যে যে পাঁচটি উপাদান থাকা অপরিহার্য সেগুলো কী কী?
৭. সময়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটির বিবরণ দিন।
৮. একার্থক পরিকল্পনা কী? একার্থক পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ কী কী?
৯. স্থায়ী পরিকল্পনা কাকে বলে? স্থায়ী পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
১০. ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের সাথে সংগতি রেখে কী কী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়? এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১১. কৌশলিক, টেকটিক্যাল ও পরিচালনিক পরিকল্পনাসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
১২. দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।
১৩. স্ট্র্যাটেজি বলতে কী বোঝেন? ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কী কী ধরনের স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা হয়ে থাকে?
১৪. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের স্ট্র্যাটেজিগুলো কী কী এবং এগুলোর মধ্যে কীরূপ পার্থক্য রয়েছে?
১৫. কৌশলিক পরিকল্পন বলতে কউ বোঝেন? কৌশলিক পরিকল্পনের জন্য কৌশলিক ভাবনা কেন প্রয়োজন?
১৬. কৌশলিক পরিকল্পনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
১৭. লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রধান দুটি উপাদান কী কী? এর যে তিনটি দিক রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করুন।
১৮. লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়? আলোচনা করুন।